পিতা

– জাহাঙ্গীর

আমার বাবা বর্তমানে সউদি আরবে আছেন। কিন্তু যে আশা আর স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছেন তা হয়তো পূর্ণ হবে না। কারণ তিনি সউদি আরব যাওয়ার সময় পুরো টাকাটাই নিয়ে যান ঋণ করে, তাও আবার সুদের ওপর। তাছাড়া দালাল যে কাজ দেয়ার কথা বলেছিল সে কাজ দেয়নি। ফলে চুক্তি মোতাবেক বারো হাজার টাকা বেতন দেয়ার কথা থাকলেও মাত্র চার হাজার টাকা বেতন দিচ্ছে। এই সব কথা জানতে পারি তিনি যাওয়ার দুই বছর পর। এতোদিন তিনি কথাগুলো গোপন রেখেছেন। কেন গোপন রেখেছেন তাও জানি না।

এদিকে সুদের টাকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সকালবেলা মায়ের ঘুম ভাঙে পাওনাদারের বকাবকিতে।

এবার বলছি আমার পরিচয়। আমরা চার ভাই, এক বোন। ভাইদের মধ্যে আমি বড়, ছোট দুই ভাই পড়ালেখা করে। আর বোন আমার বড়। তাকে বিয়ে দিয়েছি ১৯৯৫ সালে। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে সংসারের দায়িত্বটা আমার ওপরই পড়েছে। তখন আমি মাত্র এসএসসি পরীক্ষার্থী। ঠিক সেই মুহূর্তেই নেমে এলো আমার জীবনে এক ভয়াবহ ঝড়। সেই ঝড়ই ছিনিয়ে নিয়ে গেল জীবনের সকল আশা–আকাঙ্ক্ষা। এ অবস্থায় আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া খুব অসাধ্য ব্যাপার ছিল। তবুও চেষ্টা করেছি পরীক্ষা দেয়ার জন্য। কিন্তু পৃ–টেস্ট পরীক্ষার সময় মাত্র নয়শ টাকা বাকি জমেছিল স্কুলে। সামান্য এ টাকার জন্য অনেকের কাছেই হাত বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু পাইনি। তাই প্রচণ্ড রাগে, মনের দুঃখে পরীক্ষা দেয়া হয়নি।

কোনো উপায় না পেয়ে নেমে পড়লাম কর্মজীবনে। অনেক কষ্টে ড্রাইভিং শিখলাম। ভাগ্য কিছুটা ভালো হওয়াতে একটা চাকরিও ফেলাম। কিন্তু মাত্র পাচ হাজার টাকার জন্য লাইসেন্স করতে পারিনি। বিআরটিএ–তে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েছি। সেখানেও ঘুস ছাড়া পাস করা যায় না। তাই লাইসেন্স ছাড়া মাত্র দুই হাজার টাকা বেতনে চাকরি করতে হচ্ছে। অবশ্য থাকা–খাওয়া মালিকের ছিল। তাই আবার চেষ্টা করেছিলাম পরীক্ষা দেয়ার জন্য।

কর্মজীবনে যতোটুকু সম্ভব পড়ালেখা করে এক পর্যায়ে টেস্ট পরীক্ষাও দিলাম। কিন্তু এক সাবজেক্টে মাত্র পাচ নাম্বারের জন্য আমার ফরম ফিল আপ করেননি হেডস্যার। উল্লেখ্য যে, এবারই ছিল আমার লাস্ট ইয়ার। তাই ফরম ফিল আপ করার জন্য স্যারের পায়ে ধরে অশ্রুতে তার পায়ের নিচের মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিলাম। তবুও স্যার ফরম ফিল আপের সুযোগ দেননি।

নীরবে মাথা নিচু করে ভাগ্যকে মেনে নিয়ে বেরিয়ে এলাম স্যারের রুম থেকে। ওই দিকে আমার মা একটা বেসরকারি ক্লিনিকে একটা ছোট চাকরি করেন। কিন্তু আমি আর মা মিলে যে অর্থ উপার্জন করি তারচেয়ে বেশি জমা হয় সুদের টাকা। কাজেই সুদ দিয়েই পার পাচ্ছি না। তাছাড়া এতো বড় একটা সংসার, ছোট দুই ভাই পড়ালেখা করে, তাদেরও তো একটা খরচ আছে! আর দুইবেলা তো অন্তত দুটো ডালভাত খেতে হয়। ভাড়া বাসায় থাকি।

আমার বাবা যে টাকা একেবারে পাঠান না তাও না। যে টাকা পাঠান তা দিয়ে হয়তো সংসারটা চলে। আর আমি এবং মা সুদের টাকা দিচ্ছি। আসল টাকা দেয়ার কোনো নামগন্ধই নেই।

সুতরাং এ কেমন প্রবাস জীবন কাটাচ্ছেন আমার বাবা? কেউ কি বলতে পারেন, কেন আমার বাবার কোনো আশাই পূর্ণ হলো না?

আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন ঋণমুক্ত হয়ে সংসারটাকে দাড় করাতে পারি।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

লজ্জা

– আলমগীর

হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে টেবিলের ওপর প্রেরকের ঠিকানাবিহীন একটি চিঠি পেলাম। প্রবাস জীবনে যেখানে আপনজনের হাতের স্পর্শ নেই, নেই পরিচিত কোনো মুখ বা মুখের ভাষা। এই আনন্দহীন নীরস মুহূর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা চিঠি সত্যি আমার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে এনেছিল। চিঠিটা খুলে দেখলাম মেয়েলি হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ছোট একটা চিঠি যেখানে বলা হয়েছে আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। মতামত জানিয়ে পত্র লিখলে খুশি হবো।

লিখে ফেললাম আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে।

২০০২ সালের মাঝামাঝি সময়ে এভাবেই শুরু হয়েছিল আমাদের পত্র মিতালি, কতো মান–অভিমান, সুখ–দুঃখ আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে চলতো আমাদের পত্র বিনিময়। ইতিমধ্যে আমরা পরস্পরকে না দেখেই প্রেমে পড়ে গেলাম। সিদ্ধান্ত হলো দেশে ফিরেই তার সঙ্গে দেখা করবো।

অ্যাংলো–আমেরিকান বাহিনীর ইরাক আক্রমণের পর কুয়েত সরকার সে দেশের প্রবাসী শ্রমিকদের স্বদেশে ফেরার অনুমতি দিল এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধ শেষে আবার তাদের কর্মস্থানে ফিরিয়ে আনা হবে। জীবনের ঝুকি না নিয়ে দেশে ফিরে আমার আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে দেখা করলাম।

চিঠিতে তার নাম বৃষ্টি এবং প্রযত্নে আয়েশা খাতুন ব্যবহার করা হতো, অথচ প্রথম পরিচয়ে জানতে পারলাম তার আসল নাম আয়েশা খাতুন। প্রথম দর্শনেই তাকে আমার ভালো লেগেছিল। সরাসরি জানিয়ে দিলাম তার প্রতি আমার ভালোলাগার কথা। প্রস্তাব দিলাম তাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। উল্লেখ্য, তার আর আমার একই জেলাতে বসবাস। এবং সে শহরে কোনো এক মেসে থেকে সরকারি কলেজে অনার্সে পড়ালেখা করে।

তার আম্মার সম্মতিতেই রাবেয়া একদিন আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। বাড়িতে তার এক বিবাহিত বোন এবং আম্মা ছিল। তারা আমাকে প্রচণ্ড আদর–যত্ন করতে লাগলেন। এক রাত তাদের বাড়িতে থাকলাম। মাঝে মধ্যে আবেগের বশে তাকে জড়িয়ে ধরে দুই একটা চুমু খেলাম।

পরদিন সে আবদার করলো, আমার বুক দেখবে। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন লজ্জায় তার সামনে বুক বের করতে পারলাম না তখন সে আমাকে *কাপুরুষ* নামে ডাকলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমি শার্টের বোতাম খুলে খালি গায়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ফেলে দিলাম। আমি যেন জ্ঞান শূন্য হয়ে তার ঠোট, মুখ, জিভ থেকে শান্তির পরশ নিচ্ছিলাম। শুধু চূড়ান্ত কাজ ছাড়া যখন সব কিছুই চলছিল তখন তার আম্মার ডাকে জ্ঞান ফিরে পেলাম। আমি উঠে বিছানায় বসতেই তাকে তার মা ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন।

জানি না তাকে সেদিন তার মা কেমন শাসন করেছিলেন। তবে লজ্জায় অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে বসেছিলাম পাথরের মতো। অবশেষে যখন আমার বিদয়ের মুহূর্তে উপস্থিত হলো তখন আমাদের দুইজনকে ডেকে তিনি বললেন, প্রেমের সম্পর্ক পবিত্র সম্পর্ক, এই পবিত্র সম্পর্কেকে তোমরা বিয়ের আগে অপবিত্র করো না।

হয়তো যৌথ বাহিনীর বর্বর হামলা শেষে কর্মস্থানে ফিরে যাবো। জানি না, আমাদের কলমি বন্ধুত্ব স্থায়ী রূপ নেবে কি না। তবে একটা কথা স্পষ্ট যে, আমি আর কখনোই তার আম্মার সামনে যেতে পারবো না।

যশোর থেকে

মিসকিন

– হারুন আল রশীদ ফয়সাল

১৯৯৭–এ গিয়েছিলাম সউদি আরব। কথা ছিল ভালো একটি চাকরি পাবো। খুব ভালো একটা চাকরিও হয়ে গেল। বেশ সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিল। অবশ্য আমি আগেও জানতাম সউদিয়ানরা নাকি প্রবাসী যে কোনো দেশের লোককে *মিসকিন* বলে সম্বোধন করে।

একদিন আমি কাজ করছি, এক কফিল হঠাৎ কথার মাঝে মিসকিন শব্দটা ব্যবহার করলো। নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না, খুব জোরেসোরে দিলাম ওর নাক বরাবর এক ঘুষি।

দরদর করে রক্ত ঝরছে ওর নাক থেকে। অবশেষে চাকরিটা হারালাম।

চলে এলাম আমার জন্মভূমি বাংলাদেশে। বেশ ভালোই সুখেই আছি এখন। আসলে মানুষের মন বলতে বাংলাদেশের মানুষের মতো বড় মন পৃথিবীর কোনো মানুষের নেই। এখানে মানুষ হাজার গরিব হলেও কেউ কাউকে মিসকিন, গরিব বলে হেয় করে না। অন্তত এ আত্মসম্মান বোধটা বাঙালির আছে যেটা সউদিয়ানদের নেই। কি বলেন যাযাদির পাঠক পাঠিকারা, আমার ওই প্রতিবাদটা কি খুব অন্যায় হয়েছে?

উত্তর কাট্টলী, চাটগা, থেকে

ধর্ম

– মোহাম্মদ শাহ এমরান

জন্মগতভাবে মুসলমান হওয়ায় এবং মুসলিমপ্রধান দেশে বসবাস করায় ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ তেমনভাবে কখনো জাগেনি। আর আমাদের এলাকাটি হিন্দুপ্রধান হওয়ায় হিন্দু ধর্মের দৈনন্দিন ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পর্কেও কম বেশি জানতাম।

জাপানে আসার পর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে একটা নতুন অনুভূতি ও জানার আগ্রহ জাগে। জাপানের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের কোনো প্রভাবই নেই যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই নির্দিষ্ট দিন–ক্ষণে কম বেশি বৌদ্ধ ধর্মীয় আচারদি পালন করে থাকে। জাপানিজদের আদি ধর্ম *শিন্টু ধর্ম*। এর সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের হুবহু মিল রয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই।

জাপানিজ ভাষায় ধর্মকে বলে *কিয়ু।* ইসলাম কিয়ু বা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ার অন্যতম কারণ হলো এখানে আসার পর ধর্ম সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া। যেমন *এক.* ইসলাম ধর্মে চার স্ত্রী রাখার বিধান কিভাবে গ্রহণযোগ্য? *দুই.* ইসলাম ধর্মের লোকজন কেন এলকোহল ও শুয়োরের মাংস (ইংরেজিতে পর্ক, জাপানিজে *বুতা নিকু*) খায় না? *তিন.* মহিলাদের বোরখা পরা? *চার.* সউদিতে নারীদের গাড়ি চালানো কেন নিষেধ? ইত্যাদি।

বিন লাদেন ও তার সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক আল–কায়েদা কর্তৃক ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে (নাইন ইলেভেন হিসেবে খ্যাত) আমেরিকান সামরিক ও অর্থনৈতিক আভিজাত্য ধ্বংস করার পর সারা বিশ্বে সবার মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ তীব্রভাবে বেড়ে যায়।

বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকা, ইওরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ওয়েবসাইট খুলে ইসলাম ধর্মের ভালো ও মন্দ দিকগুলো তুলে ধরে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে। তবে বেশির ভাগ লেখকই ইসলামের মন্দ দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আবার কোরআনের জিহাদ সম্পর্কিত

আয়াতগুলোতে সন্ত্রাসের উস্কানি সন্ধান ও মুহাম্মদ (সাঃ)–এর ব্যক্তি চরিত্র নিয়ে টানাটানি করছেন। এবং আমেরিকান কর্তৃক বাংলাদেশকে আইএনএস তালিকাভুক্ত করায় এ লেখা–লেখি একটি ভিন্নমাত্রা পায়।

২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বে চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান দিকটি নতুন মাত্রা লাভ করে। আফগানিস্তানের তালিবান সরকার সমর্থক কিছু ইসলামপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠন প্রকাশ্যে সরব হয়। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয় সউদি নাগরিক বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্ম এবং সউদি অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের অংশীদার প্রধান ধর্মীয় দলটির (জামায়াত–এ–ইসলামী) ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের জোর কর্মপরিকল্পনা।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং জাতিগোষ্ঠি হিসেবে মুসলমানরা ক্রমাগত কোণঠাসা অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে –

এক. শিক্ষার নিম্নহার : সমগ্র বিশ্বেই জাতিগতভাবে মুসলমানরা শিক্ষা–দীক্ষায় পিছিয়ে আছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে মুসলমানরা শত বছর পিছিয়ে আছে। মুসলিম দেশগুলোতে বিশ্বমানের একটি ইউনিভার্সিটিও নেই যেখানে বাস্তবমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা হয় বা হচ্ছে। আর আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর অবস্থা তো পাঠকদের নখদর্পণে।

দুই. নৈতিকতাহীন নেতৃত্ব : মুসলিম দেশগুলোতে খুব কম নেতাই আছেন যার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও নারী কেলেংকারি, স্বজনপ্রীতি, স্বৈরাচারী আচরণের অভিযোগ নেই। সৎ, শিক্ষিত, দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মার প্রতি সহানুভূতিশীল নেতা মাইক্রোস্কোপ দিয়েও খুজে পাওয়া যাবে না।

তিন. রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিতি : সুস্থ ও স্বাভাবিক গণতন্ত্র আছে এমন কোনো মুসলিম দেশ বর্তমান বিশ্বে নেই। রাজতন্ত্র, বাদশাতন্ত্র, প্রেসিডেন্টতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, বিকৃত সমাজতন্ত্র, জগাখিচুড়ি গণতন্ত্র, বা পরিবারতন্ত্র হলো মুসলিম দেশগুলার শাসন ব্যবস্থার নমুনা। বাংলাদেশসহ দুই একটি দেশে নামকাওয়াস্তে গণতন্ত্রের নামে পরিবারতন্ত্র বহাল থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানরা জবাবদিহিতার গরজ অনুভব করেন না।

চার. নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের অভাব : মুসলিম বিশ্বে নারীদের অবস্থা কতোখানি করুণ তা সউদি আরবের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সেখানকার মহিলাদের জন্য গাড়ি চালানো দণ্ডনীয় অপরাধ। সউদি সমাজ ব্যবস্থার এই বৈষম্যমূলক দিকটি নিয়ে আমার প্রফেসর পর্যন্ত আমাকে প্রশ্ন করেছেন। জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নারী ও পুরুষের জন্য ফরজ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান যুগে এসেও আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মোল্লা–মৌলভী মেয়েদের পড়াশোনার দরকার নেই বলে ওয়াজ–নসিহত করছেন। মাঝে মধ্যে মনে হয় এসব মোল্লাদের মুখে থুথু দিই।

পাচ. ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ এবং তাতে কিছু অর্বাচীন ব্যক্তি ও রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থন দান : ইসলাম ধর্মে সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও কিছু ভ্রান্ত মুসলিম ওই পথে এগোচ্ছে। আর এর ফাদে পড়ে কাশ্মিরি, প্যালেস্টাইনি, চেচনিয়ান, বসনিয়ান ও অন্যান্য জায়গায় স্বাধীনতাকামী সংগ্রামরত মুসলিম জ্যাতিগোষ্ঠি সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে।

ছয়. ধর্মীয় গোড়ামি : মুসলমানরা সেই বারো শতকের পর থেকেই শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরতে সরতে তারা একই সঙ্গে শিক্ষা ও ধর্মের আলো থেকেও যোজন যোজন মাইল দূরে সরে গেছে। ধর্মের নামে চলছে যাবতীয় অধর্মাচার এবং প্রায় দেশেই ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষমতা আকড়ে ধরে রাখার কিংবা ক্ষমতায় যাওয়ার বাহন হিসেবে। আর সেজন্য গণমুখী দলগুলোও ধর্মমুখী দলগুলোকে আদর–আপ্যায়ন করতে দ্বিধা করে না। বাংলাদেশই তার বড় প্রমাণ।

জাপান থেকে

বিদেশের মাটিতে দেশের মাটিতে

– কবির মাহমুদ

দীর্ঘ তিন বছর থাইল্যান্ডে ছিলাম। দেশে ফিরে এসেছি গত বছর। দেশটি খুবই সুন্দর। ফৃ সেক্সের দেশ থাইল্যান্ড। থাইল্যান্ডে সেক্স করার জন্য সরকার অনুমোদিত পতিতালয় আছে। থাইল্যান্ডের রাজস্ব আয়ের একটি অংশ এই পতিতালয় থেকে আসে।

পতিতালয়ে কমপক্ষে আঠারো বছরের নিচে কোনো মেয়ে থাকতে পারে না। থাইল্যান্ডে থাকাকালে প্রতি সপ্তাহে একবার সেখানে যেতাম। পতিতালয়ের ভেতর ছিল পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন এবং মনকাড়া।

নিয়মিত যাওয়া–আসার ফলে ফ্লোরা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে আমার রাতযাপন হয়েছে বেশি। মেয়েটা ছিল সুন্দরী। সেখানকার পতিতারা বেশ স্মার্ট। খদ্দের এলে প্রথমে তারা নিজেদের নির্ধারিত ঘরে নিয়ে গিয়ে সামান্য আপ্যায়ন করায়। ফ্লোরাও আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সামান্য সফট ড্রিংকস পান করাতো। তারপর আমাকে খাটের ওপর বসিয়ে আমার শরীরের সব কাপড় খুলে নিতো। আমাকে ওর কাপড় খুলে দিতে বলতো।

মিলনের আগে ফ্লোরা আমাকে কনডম পরিয়ে দিতো। কনডম ছাড়া সেখানে মিলিত হওয়া অন্যায়। তারপর আমি ওর সঙ্গে মিলিত হতাম।

ওর সঙ্গে মিলিত হয়ে সত্যিই অন্য রকম আনন্দ অনুভব করতাম। ফ্লোরাকে ঘণ্টায় দশ বাথ (থাইল্যান্ডের মুদ্রা) করে দিতে হতো।

আমি ঢাকার পতিতা পল্লিতেও গিয়েছি। সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কিছু ভালো ভালো মেয়ে আছে। কিন্তু বেশির ভাগ মেয়েই অল্প বয়েসী।

থাইল্যান্ডের পতিতাদের জন্য সব সময় ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা খুবই ঝুকিপূর্ণ। বাংলাদেশে কিছু অভিজাত অঞ্চলে পতিতার ব্যবস্থা আছে। সেখানে গিয়ে জানতে পেরেছি তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী। ছাত্রী জীবন যাপনের জন্য তারা এই ব্যবসা করে। এই মেয়েগুলো বেশ সেক্সি এবং তারা উন্নত সেক্স সম্পর্কে জানে। এদের দাম কমপক্ষে এক হাজার টাকা। তারা খদ্দেরের চাহিদা বোঝে। নিজেদের শরীরের প্রতি তারা যত্নবান।

আমি মনে করি, বাংলাদেশে ধর্ষণ প্রবণতা কমানোর জন্য সরকার অনুমোদিত পতিতা পল্লি থাকা প্রয়োজন। যেমনটি রয়েছে থাইল্যান্ডে। থাইল্যান্ডে ফৃ সেক্সের ব্যবস্থা থাকার ফলে ধর্ষণের মাত্রা শূন্যের কোঠায়।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

আত্মকথা

– রাহমান মণি

আমি একজন জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি যুবক। জাপান থাকা অবস্থায় আমার জীবনে পাচ পাচটি ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল, সতেরোটি বসন্ত, পয়ত্রিশটি ঈদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এসেছে যা ভবিষ্যতে মনে রাখার মতো। ছাত্রবেলায় পরীক্ষাতে আসবে বলে কতো *আত্মকথা* যে মুখস্থ করেছি তার সঠিক হিসাব জানা না থাকলেও *বটগাছের আত্মকাহিনী, একটি ছাতার আত্মকাহিনী, একটি টাকার আত্মকথা* কিংবা এই জাতীয় আত্মকথার কথা আজও মনে পড়ে। আবার বড় বড় মনীষীদের আত্মজীবনীও পড়েছি। জেনেছি তাদের নানান কথা।

কিন্তু বাস্তব জীবনেও যে আত্মকথা লেখার মতো পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে সে কথা কস্মিনকালেও কল্পনা করিনি।

বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী আমি এক যুবক। ১৯৮৫ সালে ডিগ্রি পাস করার পর পরই কাজের সন্ধানে চলে আসি জাপান। তখন অবশ্য বিভিন্ন পণ্যের মেড ইন জাপান ছাড়া জাপানিজ কালচার, জাপানিজ ভাষা বা জাপানিজদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। তাই জাপান নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের অনেক টিটকারী সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন কিংবা অস্ট্রেলিয়া হলে হয়তো সবাই অভিনন্দন জানাতো।

আদম ব্যাপারীর মাধ্যমে ব্যাংককে দশ দিন থেকে চলে আসি জাপান। এসেই মন খারাপ হয়ে যায় স্বদেশি ভাইদের বিভিন্ন কথায়। প্রতিটি মুহূর্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন। এ যেন ইন্টারভিউ। অবশ্য সবই নেগেটিভ। কিন্তু আমার যে পিছপা হওয়ার পথ খোলা নেই। বড় ভাইয়ের আর্থিক সহায়তায় এবং মায়ের সম্মতিতে জাপান আসা। মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য আমি। কাজেই যে ভাবেই হোক জাপানকে জয় অর্থাৎ প্রবাস জীবনকে জয় করতেই হবে। তবে জাপান আসার পর বাংলাদেশিভাইদের যে ব্যবহারটি আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিয়েছে তা হলো, একজনকে দেখলে অন্যজনের মুখ ফিরিয়ে নেয়া। যেমন তার সঙ্গে কথা বলা জাপান আইনে নিষেধ অথবা কথা বলে কোন বিপদেই না পড়তে হয়! হয়তো চাকরি কিংবা বাসা (থাকার স্থান) চেয়ে বসবে।

কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম বিদেশে নাকি দেশের *কাউয়া* (কাক)কেও ভালো লাগে! সালাম দিলেও প্রতিউত্তর পাওয়া দুর্লভ ছিল। ভাবটা এই রকম যে, *ব্যাটা আইছস জাপান বিধর্মীর দেশে, আবার সালাম দেয়ার দরকার কি?*

অথবা কথা বললে ভিসার সমস্যা হতে পারে। এই ব্যথা দীর্ঘ দেড় যুগ পরেও আমার মনে গেথে আছে। আমার আবার একটি বদঅভ্যাস আছে। আমার গায়ের রঙ-এর কোনো মানুষকে দেখলেই সালাম দিতে অথবা নিদেনপক্ষে হাসিমুখে তাকে অভিবাদন জানাতে চেষ্টা করি।

আমাদের দেশে একটি গ্রাম্য প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোনো খারাপ কাজ করলে লোকে বলে, *আউয়ালও নেই আখেরও নেই।* অর্থাৎ একূল-ওকূল কোনো কূলই নেই। প্রবাস জীবনেও আমার কাছে কেন জানি সেই প্রবাদটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

জাপানে আমাকে বলা হয়, বিদেশি বা ভিনদেশি। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজ দেশে গেলেও আমাকে বলা হয় জাপানিজ। অর্থাৎ নিজ দেশেও হয়ে যাই বিদেশি। কাকে দোষ দেবো? আমরা বাংলাদেশিরা যে বিশেষণের ভারে ভারাক্রান্ত। কাউকে বিশেষণে ভূষিত করতে এবং নিজেও ভূষিত হতে পছন্দ করি। এ যেন নামের আগে-পিছে কিছু একটা বিশেষণ যোগ হলে নামের শ্রী বৃদ্ধি পায়।

তারপর প্রবাসী হিসেবে আমার রয়েছে আবার কলংক। মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেও হয়ে গেছি *রাজাকারের বাচ্চা*-শেখ হাসিনার ভাষ্য মতে। বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষেও কেউ রাজাকার ছিল বলে আমার জানা নেই। তবে হাসিনা যদি মনে করেন যে, যেহেতু তার জামাতা মশরুর রাজাকারের বাচ্চা এবং যেহেতু তার জামাতা প্রবাসী, যেহেতু এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, এখানে এক প্রবাসী অন্য প্রবাসীর সেহেতু প্রবাসীরা সব রাজাকারের বাচ্চা।

হাসিনা সবাইকে পুতড়ো (জামাইয়ের ভাই) মনে করলেও প্রবাসীরা সবাই হাসিনাকে মায়ই মা (ভাই বা বোনের শাশুড়ি) মনে করেন না। তাই দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাই, আমি মশরু নই, রাজাকারের বাচ্চা নই।

বাংলাদেশের প্রতি আমার যথেষ্ট দেশাত্মবোধ রয়েছে। তাই তো বাংলাদেশের কোনো ভালো খবরে যেমন পুলকিত হই আবার তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ব্যর্থতায় হই ব্যথিত। প্রবাসে হাসিনার

বেফাস কথায় হই বিচলিত, শংকিত। আমার মতো আমেরিকান প্রবাসীরাই জানে, তারা বর্তমানে কেমন শংকায় জীবন কাটাচ্ছে। এবং বাংলাদেশে তার পরিবার পরিজন। অথচ এ প্রবাসীরাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার। প্রবাসীরা রেমিটান্স না পাঠালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শূন্যের কোঠায় আসবে, আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে।

সরকার যে এটা উপলব্ধি করে না তা নয়। তাই তো বর্তমান সরকার প্রবাসীদের রেমিটান্স প্রবাহ বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তৈরি করেছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ঘোষণা করেছে বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার কথা। কিন্তু সেগুলো কেবলই কাগজ–কলমে এবং বক্তৃতা–বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ। প্রবাসীরা বাস্তব জীবনের কল্যাণের মুখ দেখেনি।

সরকার আসবে, সরকার যাবে আর প্রবাসীদেরকে নিয়ে তামাশাও চলতে থাকবে। এ যেন হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। তাই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, প্রবাসীরা আপনাদের কনডম নয়, প্রবাসীদের নিয়ে তামাশা বন্ধ করুন। প্রবাসীদের যতোটা বোকা আপনারা ভাবছেন ততোটা বোকা প্রবাসীরা নয়। এবং বাংলাদেশে আপনাদের দলীয় বুদ্ধিজীবী নামধারীদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সবার না থাকলেও প্রবাসীরা বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত। রুটি–হালুয়ার ভাগ দিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে কোরাস গাওয়ানো যাবে। কিন্তু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রবাসীদের হাত করা যাবে না।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবাসীকে নিয়ে কম ব্যঙ্গ করা হয় না। প্যাকেজ প্রোগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর এই অত্যাচারের পরিমাণ বেড়েছে। প্রায় নাটকেই প্রবাসীদের ছোট করা হয়। কটাক্ষ করাই যেন নির্মাতাদের কাজ। অথচ শিল্পী, কলাকুশলীরা যখন প্রবাসে আসেন বিভিন্ন আমন্ত্রণে তখন আমার মতো প্রবাসীর আতিথেয়তা গ্রহণ এবং বিভিন্ন উপহার নিঃসংকোচে দাবি করেন এবং আদায়ও করেন।

প্রবাসীর দুঃখ আরো বাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ। পোস্ট অফিসের সার্ভিসের কথা যতোটা না বলা যায় ততোই মঙ্গল। কারণ এতে করে আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থা আবার লজ্জা পাবে। অবশ্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ লজ্জা পাবে না, পাওয়ার কথাও না। কারণ তাদের লজ্জা নেই।

এতো গেল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কথা। পারিবারিক পর্যায়ে প্রবাসীরা কতোটুকু সুখী? যে পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সবাইকে ছেড়ে একাকীত্ব জীবন যাপন করছে সেই পরিবার তার প্রতি কতোটুকু সহানুভূতিশীল?

প্রবাস থেকে কিছু টাকা, উপহার পাঠানোর পর কতোজন প্রাপ্তি স্বীকার করে পত্র দেয় বা যোগাযোগ করে। বরং উল্টো আরো টেলিফোন করে খোজ নিতে হয় বার বার, দিকনির্দেশনা দিতে হয়। ধন্যবাদ জানানো তো দূরের কথা, প্রাপ্তি স্বীকারটুকু জানালেও নিজেকে ধন্য মনে হয়। কোনো কিছু চাওয়া–পাওয়ার প্রয়োজন না হলে বন্ধু–বান্ধব যোগাযোগ করে না। স্বাভাবিক যোগাযোগ রাখতে নেই এই বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী। তবে দেশে গেলে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের কথা বলে এবং নিজেদের ফুর্তি করার কথা বলে চাদাবাজি করতে ভুল করে না।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে প্রবাস জীবনের একাকীত্ব ঘোচাতে, স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হতে প্রবাসীরা যখন দেশে যায় তখনই এয়ারপোর্টে নামার পরই শুরু হয় ভোগান্তি। বেঘোরে প্রাণহানির ঘটনার নজিরও রয়েছে বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে। কিন্তু তার কোনো সুষ্ঠু বিচার আজও হয়নি। লাগেজ লাপাত্তা, মালামাল তছনছ তো নিত্যদিনের ঘটনা। এয়ারপোর্ট কাস্টমস কোনো রকমে পার হলেও পরে শুরু হয় দফা অর্থাৎ মালামাল টানাটানি। অসহায়দের করুণ আর্তনাদ শুনে, দেখে নিজেকে আরো বেশি অসহায় মনে হয়।

অজানা আশংকায় নিরাপদে নয়, কোনো রকম নিজ এলাকায় পৌছানোর পর আরম্ভ হয় আরেক দফা অত্যাচার। উন্নয়ন করার নামে শুরু হয় বিভিন্ন চাদাবাজি। মসজিদ, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট করা

যেমন সবাইকে দিয়ে হয় না তেমনি এইগুলোর নামে চাদাবাজি করাও জায়েজ না। দান–খয়রাত যার যার নিজ সামর্থ এবং অভিরুচি অনুযায়ী করতে দেয়া উচিত। নির্দিষ্ট অংকের চাদা চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়।

প্রবাসী হিসেবে প্রবাসেও কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না। প্রবাসে রয়েছে আবার দলাদলি। রাজনৈতিক দল এবং তাদের অংগসংগঠন তো রয়েছে বটেই। বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দলেও রয়েছে নেতৃত্বের কোন্দল। প্রবাসে এসে বাস্তব দেখেও বাঙালি তার স্বভাব বদলাতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, *সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।*

সংগঠনকে দেয়ার জন্য সবারই এগিয়ে আসা উচিত। কিছু পাওয়ার জন্য নয়, বিশেষ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোতে। কিন্তু সবাই চায় সংগঠনকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সুবিধা পেতে যা প্রবাসী হিসেবে আমি মনে কষ্ট পাই। বিশেষ করে বিদেশিদের কাছে যখন হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। প্রবাসেও সংগঠন করতে গিয়ে কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি, মারামারি থেকে খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়। জাতি হিসেবে আসলেই আমরা মানুষ হইনি।

প্রবাসী হলেও আমি একজন মানুষ। তাই সুখ–দুঃখ, হাসি–কান্না, আনন্দ–বেদনা থাকাটাই স্বাভাবিক এবং সেটার প্রকাশও ঘটে। তবে সেই প্রকাশ ঘটানো যেন নিজ আয়ত্তের মধ্যেই থাকে।

একজন প্রবাসী হিসেবে বিশ্বের সকল প্রবাসীভাইদের অনুরোধ করবো, কোনোমতেই যেন বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন না হয়। কারণ বাংলাদেশ আমাকে একটি পাসপোর্ট দিয়েছে যার বদৌলতে আমি আজ জাপান প্রবাসী।

টোকিও, জাপান থেকে

বেবীআপা

– জসীম

১৯৯৪ সাল। সবেমাত্র ক্লাস নাইন–এর ছাত্র। ভাইয়ের কাছে থেকে পড়ালেখা করছি। ভাই ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় কর্মরত। আমি ও ভাই ব্যাচলর কোয়ার্টারে থাকতাম। ওটা ছিল টিলার ওপর। পাশের কোয়ার্টারে কামাল নামে ভাইয়ের এক কলিগ সপরিবারে থাকতো। ওই পরিবারের সঙ্গে আমার ও ভাইয়ের যাতায়াত ছিল।

একদিন স্কুল শেষে বাসায় ফিরছি দেখি বারান্দায় একটি মেয়ে দাড়ানো, পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। রুমের দরজা খুলতে গিয়ে কয়েকবার চোখাচোখি হলো। লজ্জায় তাকাতে পারিনি। পরবর্তীকালে ভাইয়ের কাছে জানতে পারি, সে কামালের ছোট বোন। নোয়াখালির সেনবাগে থাকে। এখানে বেড়াতে এসেছে।

কয়েকবার দেখা হয়েছিল সত্যি। কিন্তু কোনো আলাপ হয়নি। হঠাৎ এক বিকেলে মেয়েটি আমাকে নাম ধরে ডাক দিল এবং ইশারা করলো কাছে যেতে।

আমি তো হতবাক, নাম জানলো কিভাবে, যাক, সাহস করে গেলাম এবং সালাম জানালাম।

মেয়েটি নাম বেবী। আমি তাকে বেবীআপা সম্বোধন করলাম। এইচএসসি শেষ করেছে। লম্বা, সুঠাম দেহের অধিকারী। জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে নাম জানলেন?

উত্তরে বললেন, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওনার কাছে জানতে পারি।

এভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে এশার আজান শেষ হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য নেই। অবশেষে সে দিনের জন্য বিদায় নিলাম।

তারপর সকাল, বিকেল ও রাত যখননি সময় পেতাম তখন তার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতাম। বন্ধুরা রাগ করতো। কারণ তাদেরকে সময় দিতে পারতাম না। বেবীআপা সব সময় বই পড়তেন, আমার ভাই বইয়ের যোগান দিতেন।

একদিন বেবীআপার সঙ্গে বেড়াতে গেলাম চা বাগানে। কতো কথা, ঠাট্টা, ছোট ছোট দুষ্টুমি করতাম তিনি শুধু হাসতেন আর স্নেহ করতেন। আমি স্নেহের কারণ জানতে চাইলাম।

উত্তর দিলেন, কোনো কারণ নেই, তোমাকে ভালো লাগে তাই।

বললাম, না কোনো ইসু ছাড়া কোনো মেয়ে কাউকে অতিরিক্ত স্নেহ ও আদর করে না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বললেন, একটা ইসু আছে, সেটা তোমাকে যাবার আগে বলে যাবো, এখন নয়।

এভাবে চলতে লাগলো দিনের পর মাস। লক্ষ্য করলাম, পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটছে। পড়ার জন্য কয়েকবার ভাইয়ের কাছে মার খেয়েছি। অতিরিক্ত পড়েও ফল শূন্য। প্রতিজ্ঞা করেছি, তার সঙ্গে দেখা করবো না, ঘনিষ্ঠভাবে মিশবো না। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি বার বার।

একদিন ভাই ঢাকায় গেলেন। কাজের বুয়াকে বিদায় দিয়ে বেবীআপাকে রান্নার দায়িত্ব দিলাম। রান্না শেষে এক প্লেটে, বেবীআপার হাতে আমার ক্ষিধে মিটলো। গল্প করতে করতে এক পর্যায়ে বলে ফেললাম, আপনি যদি আমার সমবয়সের হতেন তাহলে আপনাকে বিয়ে করতাম।

তিনি জবাব দিলেন সত্যিকারের মানুষ হও, আমার চেয়ে ভালো মেয়েকে তুমি জীবনসঙ্গী হিসেবে পাবে।

বিদায় মুহূর্তে বললাম। আপনাকে একটা জিনিস উপহার দেবো যা কোনোদিন কেউ কাউকে দেয়নি।

তিনি তো আনন্দে আত্মহারা। ঠিক আছে দাও তোমার উপহার।

বললাম, চোখ বন্ধ করতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। আমি আস্তে তার লাল গালে দুটি চুমু দিলাম। এই ছিল আমার বিশেষ উপহার।

বেবীআপা মিষ্টি হেসে চলে গেলেন।

তারপর থেকে যখনই সুযোগ মিলতো তখনই চুমু খেতাম। বেবীআপা কিছুই বলতেন না। শুধু বলতেন, খুব দুষ্টু হয়েছো।

আমার দুষ্টুমি ওই চুমু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

একদিন রাতে বেবীআপাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিলাম। তার ভাবী সেটা দেখে ফেলেন এবং কামালভাইয়ের কাছে বলে দেন। রাতে বেবীআপার সঙ্গে কামালের ভাইয়ের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে কামালভাই বেবীআপাকে দুইটা থাপ্পর মারেন। রাগে বেবীআপা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেন। আমার ভাই শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ করেছেন।

দুই তিন দিন দেখা নেই, যোগাযোগ নেই। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। যখন দেখা হলো তখন তার বক্তব্য ছিল এই, ভাই আমাকে মেরেছেন তাতে দুঃখ নেই! কিন্তু তুমি কেন আসোনি! তাতে দুঃখ পেয়েছি।

তার কাছে ক্ষমা চাইলাম।

তার দুই দিন পর সকালে ক্লাস করার জন্য রুম থেকে বের হলাম এবং বেবীআপার সঙ্গে দেখা হলো।

তিনি জানালেন, আজ আমি চলে যাচ্ছি, গত রাতে ভাই ট্রেনের টিকেট এনেছেন।

আমার যেন বিশ্বাস হয়নি কথা। যাওয়ার সময় আমাকে ইশারা দিলেন আমি পিছে পিছে টিলার সিড়ি পর্যন্ত এলাম। বেবীআপা বুকের ভেতর থেকে এক টুকরা চিরকুট মাটিতে ফেলে দিল এবং আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

হাতে নিয়ে ওনার চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করলাম। সেই সময় আমার হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছিল, এ কি ভালোবাসা না অন্য কিছু?

রুমে এসে চিঠিটি পড়লাম। তাতে লেখা ছিল :

তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে কেন তোমাকে আমি বেশি স্নেহ করতাম। তার একমাত্র কারণ হলো আমি তোমার ভাইকে খুবই পছন্দ করতাম এবং ভালোবাসতাম। কিন্তু কোনোদিন তোমার ভাইকে তা বুঝতে দিইনি। কারণ তোমার ভাই হাসিকে ভালোবাসে। তোমাকে আমি ছোট ভাই অর্থাৎ দেবর হিসেবে দেখেছি। আমি হয়তো তোমার ভাইয়ের মতো স্বামী আর তোমার মতো দেবর কোনোদিন পাবো না। ঠিকানা দিলাম, চিঠি দিও।

তারপর বেবীআপার সঙ্গে চার পাচটি চিঠি দেয়া-নেয়া হয়েছে। বর্তমানে আমি প্রবাস জীবনে আছি। বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার মাঝেও ছোটবেলার হৃদয়ে দাগকাটা বেবীআপার স্মৃতিটুকু আজও ভুলতে পারিনি। হয়তো ভুলতে পারবো না?

আলহাসা, সউদি আরব থেকে

আম্মার কণ্ঠস্বর

– খান জাহেদ হোসেন

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৯১ সালে অনার্স পরীক্ষার পর সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণের জন্যে ঢাকা কলেজ ও ইউনিভার্সিটি জীবনের সহপাঠী কাঞ্চন এবং টুটুলসহ ইনডিয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালের ১৭ জুলাই যাত্রা করি। প্রায় আটাশ দিন ইনডিয়ার বিভিন্ন শহর ঘুরে পাকিস্তানের লাহোর হয়ে বাঙালি অধ্যুষিত করাচি নগরীতে আমরা পৌছি। ইতিমধ্যে কলকাতার সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের সহযোগিতায় দেশে সংবাদ পাঠাই যে, ইনডিয়া সফর শেষ করে আমরা আগামী মাসে পাকিস্তান যাবো।

করাচিতে গিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের ভিসা সংগ্রহ এবং বাঙালিদের আতিথেয়তায় এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, দেশে যোগাযোগের কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। করাচিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে, আমরা এখানকার বাংলাদেশি এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হামিদের একটি খালি ফ্ল্যাটে অবস্থান করছি। যেহেতু এই ফ্ল্যাটে ফোন ছিল না, তাই তিনি যেখানে অবস্থান করেন সেই ফোন নাম্বার দিয়েছিলাম।

করাচি ভ্রমণের শেষ দিন ৬ সেপ্টেম্বর আমরা যখন হামিদের বাসায় দুপুর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম তখন শুনি যে, ঢাকা থেকে গতকাল আমার মামা হারুন-উর-রশীদ (আবাহনীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) ও আমার জমজ ভাই জহির ফোন করেছিল এবং আজ আমরা দুপুরে এখানে থাকবো শুনে ফোন করতে পারে বলে জানালেন। এর আগে আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে, আজ আমরা দেশে ফোন করে ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ জানাবো।

তারপর থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন ফোন আসবে। ঠিক যখন টেবিলে খেতে বসবো তখনই কাঙ্ক্ষিত টেলিফোনটি আসে এবং হামিদভাই রিসিভার তুলতেই ঢাকা থেকে কল শুনে পাশে দাড়ানো কাঞ্চনকে দিলেন এবং কাঞ্চন আমাকে দেয়।

দীর্ঘ এক মাস বিশ দিন পর প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলবো বলে বেশ আগ্রহ নিয়েই রিসিভার ধরলাম। প্রথমেই আমার জমজভাই জহিরের সঙ্গে কৌশল বিনিময়ের পর আব্বাকে দিল। আব্বা বেশ আবেগপ্রবণভাবে আমরা কেমন আছি জানতে চাইলেন এবং করাচি থেকে কোথায় যাবো তাও জানতে চাইলেন। তারপর আব্বা আমার বড় আপুকে দিতে চাইলে আমি আম্মার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তিনি বললেন, তোমার আম্মা তো নেই।

আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম, আম্মা নেই মানে কোথায়?

জানতে চাইলে আব্বা জানালেন যে, তোমার নানু অসুস্থ। তাই বড় মামার বাসায় তোমার মা তিন দিন ধরে আছেন।

আব্বার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এবং কান্না জড়িত কণ্ঠে বার বার আম্মার কিছু হয়েছে কি না তা জানতে চাইলাম।

তৎক্ষণাৎ আব্বা কিছু হয়নি বলে হামিদভাইকে চাইলে আমার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় এবং হামিদভাইকে কেন চান তা জানতে চাইলে জানালেন যে, আমাদেরকে করাচিতে এতোদিন রাখার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাবেন। তারপর হামিদভাইকে ফোনটা দিই এবং ওনার কথা বলা লক্ষ্য করতে থাকি। দেখি তিনি হাসিখুশিভাবেই কথা বলছেন।

তারপর আমাকে রিসিভার দিলে কামরুলআপু ধরলে ক্রন্দনরত অবস্থায় আম্মা কোথায় এবং কিছু হয়েছে কি না জানতে চাই।

তিনি আমাকে কিছু হয়নি বলে আশ্বস্ত করলেন। তখন আমি বললাম মামার বাসা থেকে তখনই এখানে ফোন করতে।

তিনি জানালেন যে, বড় মামার ফোন খারাপ। তখন আমার আর কারো কথাই বিশ্বাস হচ্ছিল না। এবং পাশেই অবস্থিত হারুণমামার বাসা থেকে ফোন করতে বললাম। একে একে সব ভাই-বোনকে ফোন করতে বললাম। একে একে সব ভাই-বোনকে কসম কেটে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আম্মার কিছু হয়েছে কি না? সবাই আমাকে আশ্বস্ত করলেন এবং বললেন যে, একটু পরেই আম্মা ফোন করবেন। এই বলে ফোন রেখে দিলেন।

এরপর চিন্তিত অবস্থায় খাবার টেবিলে বসলাম এবং দেখি সকলেরই খাওয়া হয়ে গেছে শুধু আমি ছাড়া। খাওয়ায় মন বসছিল না। তখন টুটুল আমাকে ধমক দিল এবং বললো যে, কিছু হলে আমি ও কাঞ্চন জানতাম। এভাবে পনেরো মিনিট পর আসে বহু প্রতীক্ষিত আম্মার ফোন। ফোন ধরার পর প্রথমে মুকুলমামার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এবং আম্মার সঙ্গে তিনি কথা বলতে বললেন।

আম্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই আমার মন আনন্দে ভরে গেল এবং এই প্রথম আমার মুখ থেকে হাসি বের হলো। তারপর আম্মার সঙ্গে প্রায় দশ মিনিট কথা বলি এবং পরবর্তীকালে যখনই বাসা থেকে ফোন করবে, আম্মা যেন প্রথমেই আমার সঙ্গে কথা বলেন এই প্রতিজ্ঞা করাই।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত যখনই বাসায় ফোন করি, তখন সবাই প্রথমেই আম্মার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেন।

ভিসেন্সা, ইটালি থেকে

কাজ

– মোহাম্মদ শাহজাহান

আমরা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি। আমাদের শৈশব, কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে বড় হয়েছি। বাংলা ভাষায় কথা বলা শিখেছি। বাংলাদেশকে আপন দেশ জেনেছি, অথচ আজ দেশ এবং জন্মভূমি ছেড়ে ভাগ্য অন্বেষণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসে হয়েছি প্রবাসী।

প্রবাসী জীবনের দুর্লভ অবসরে বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা অনেক কল্পনা করি। মনে মনে একটা দুর্নীতিমুক্ত *সোনার বাংলা* হওয়ার স্বপ্ন দেখি। পলে পলে আমাদের হাড়ভাঙা মেহনতের সঞ্চিত অর্থ দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখি। আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, *বাতাসের মধ্যে বসবাস করে আমরা ভুলে যাই বাতাসের সমুদ্রে বসবাস করছি*। প্রবাসী না হলে দেশাত্মবোধ

উপলব্ধি করা যায় না। তিনি আরো বলেছিলেন, *মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি প্রতিটি মানুষের নিকট পরম শ্রদ্ধার বস্তু।*

মাতৃভূমির জন্য আমাদের প্রাণ কাদে। আমাদের মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নি, ছেলে-মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন দেশে ফেলে এসে প্রবাসে আমরা অসহায় জীবন কাটাচ্ছি। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পারছি না। তারাও আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারছেন না। আমাদের শয়নে-স্বপনে, জাগরণে, অনুভবে একটি নাম বাংলাদেশ। অথচ ছুটিতে বাংলাদেশে গিয়েও শান্তিতে থাকতে পারি না। দেশের লোকজন আমাদেরকে লুটেপুটে খেতে চায়।

বাংলাদেশ সরকার, সরকারি কর্মচারী সকলেরই চোখ প্রবাসীর পকেটের দিকে। ছলে-বলে-কৌশলে তাদের স্বার্থ আদায়ে তারা ব্যস্ত। আমাদের সমস্যা তারা বুঝতে চেষ্টা করে না।

আমাদের দেশে নিজেদের নিরাপত্তা নেই। এর প্রমাণ সুরত মিয়া, মোগল কোরেশি হত্যাকাণ্ড। আমাদের ভোটাধিকার দেয়া হয় না। বিমানযাত্রীদের হয়রানির অবসান হয় না। বিশেষ করে বর্তমান জোট সরকার প্রবাসীর ওপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য করে। এ করের মধ্যে পাসপোর্ট ফি বৃদ্ধি। নো ভিসা ফি সহ সর্বশেষ ভ্রমণ কর ধার্য করে প্রবাসীদের বিরাগভাজন হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতার এই যুগে আমরা বসবাস করছি পৃথিবীর বিভিন্ন নামি দামি শহরগুলোতে যেখানে মানুষকে যন্ত্রের মতো কাজ করতে হয়।

সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত পরিশ্রমের পরও সবাইকে খুশি করতে পারছি না। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমাদের এ সংগ্রাম। আমাদের ধর্মীয় উৎসব ঈদের দিনে দেশে কতোই না আনন্দ-ফুর্তি করতাম। অথচ প্রবাসে ঈদ মানে দুই রাকাত নামাজ পড়া, কিছু মনঃকষ্ট, অতঃপর কাজে ফিরে যাওয়া।

এই তো আমাদের জীবন! শত ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে একটু সুখের পরশ, তারপর হারিয়ে যাওয়া।

লন্ডন থেকে

অন্ধকার শহরে এক রাত

– নাসরিন চৌধুরী

মাত্র একরাত বিদ্যুৎ ছিল না শহরে। চারদিকে যেন হাহাকার শুরু হয়ে গেল। গরম, অসহনীয় যন্ত্রণা, তারচেয়ে বেশি আতংক। বোধহয় নতুন কোনো আক্রমণ হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে কিছু সেতু, অট্টালিকা এবং নিরীহ মানুষের জীবন। নিউ ইয়র্ক থমথমে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতায় আছে, *যা কিছু খোয়া যায়, ঘর সুদ্ধ সবার অভিযোগ, অনুমান, কেষ্ট বেটাই চোর।*

কেষ্ট হচ্ছে বাড়ির চাকর। নিরীহ গোবেচারা। যেহেতু সে পেটের দায়ে গৃহভৃত্য হয়েছে, দায় তারই। সে-ই জিনিস চুরি করে। বেচারা চুরি না করেও চোরের দায় ভোগ সইতে হয়। আমেরিকায় এখন কেষ্ট হচ্ছে টেরোরিস্ট। এবং এরা মুসলিম বলেই এদের ধারণা।

১৪ আগস্ট ২০০৩-এ আমেরিকায় আরো একটি ইতিহাসের মুখোমুখি হলাম। সচরাচর এই দেশে যা হয় না তাই হলো। এ কারণেই এটি ইতিহাস। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। দুপুর সাড়ে চারটায় ফ্যান বন্ধ হয়ে গেল। এ রুম, সে রুম কোথাও এয়ার কনডিশন্ড চলছে না। ভাবলাম আমাদের বাসায়ই বোধ হয় এ অবস্থা। একটু পরেই জানলাম, সারা বিল্ডিংয়ে ইলেকট্রিসিটি নেই। এরপরও ফোনের পর ফোন। শহরময় বিদ্যুৎ নেই। রাস্তায় ট্রাফিক সিগনাল পর্যন্ত নেই। গাড়ি চালানো কঠিন। এই তো এসে যাবে, এসে যাবে। আসি আসি করে রাত এলো। মোমবাতির খোজ।

ঘর সাজানোর জন্য মাঝে মধ্যে মোমবাতি কিনি। শখ করে মাঝে মধ্যে সুদৃশ্য রঙিন মোমবাতি জ্বালাই। মোমের আলো নরম, স্নিগ্ধ। ভাগ্যিস ঘরে ছিল। সন্ধ্যার পর জ্বাললাম। বাতাস নেই। গুমোট গরম। রেডিওর খবর শোনা প্রয়োজন। বাসায় ডিজিটাল রেডিও আছে অব্যবহৃত। রেডিওর বাজার মন্দা। কমপিউটার, ইন্টারনেট, টেলিভিশন-ডিভিডি-র কাছে রেডিও ম্লান। ভাগ্যাহত রেডিওটি বের করে ব্যাটারি লাগানো হলো। খবর শোনাটা জরুরি। প্রেসিডেন্ট বুশ তার বক্তব্যে প্রথমে টেরোরিস্ট হামলার আভাস দিলেও পরবর্তীকালেই ঘোষণা দেন, ডেফিনেটলি এটি টেরোরিস্ট সম্পর্কিত নয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। কারণ অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সংকট।

যাক বাবা স্বস্তি। তবুও কি মানুষের মনে সন্দেহ ঘোচে! দোকানপাট, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেন চলাচল বন্ধ। যারা কাজে ছিল, ঘরে ফেরা মুশকিল। হঠাৎ সেলফোনটিও বোবা হয়ে গেল।

যাক। আমরা সবাই ঘরের মানুষ ঘরেই আছি। ছাদে উঠলাম। মাথার ওপর উদার খোলা আকাশ। ম্যানহাটান শহরের আলোক উজ্জ্বল অট্টালিকাগুলোতে অন্ধকার। আকাশে আজ অনেক হেলিকপ্টার। তথ্য সরবরাহ করছে। সাংবাদিকরা হেলিকপ্টারে বসে ভিডিও ক্যামেরা তাক করে রেখেছে। খবর চলে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। সারা পৃথিবী জানছে নিউ ইয়র্ক, কানাডাসহ আমেরিকার বেশ কয়েকটি স্টেটে বিদ্যুৎ নেই।

বিদ্যুৎ যে কতো প্রয়োজনীয় এ মুহূর্তে সহজেই অনুভব করতে পারছে সবাই। ফায়ার বৃগেডের গাড়িগুলো সাইরেন বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে দ্রুত। রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে মানুষের আড্ডা, আলোচনা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কেউ ঘরে থাকতে চাইছে না। রেডিওর খবরে বলা হচ্ছে, জানালা খোলা রাখতে আর বেশি বেশি পানি পান করতে। হাসপাতালগুলোতে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চালানো হয়েছে। খবরে আরো বলা হচ্ছে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ দিক হচ্ছে অসহায়ের পাশে দাড়ানো এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করা। মানুষ কখন উদার হতে পারে! যখন তার যাবতীয় চাহিদা মিটে যায়। পর্যাপ্ত থাকলে বিলিয়ে মানুষ মহত্ত্ব প্রদর্শন করে। আসলেই কি তাই? তারাই সত্যিকারের মানুষ যারা আধখানা রুটি খেয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করার সময়, ক্ষুধার্থ কাউকে পাশে দেখলে সেই আধখানা রুটি ভাগ করে খায়।

আমেরিকার মানুষের পেট কি উপচানোভাবে ভরে গেছে। তাদের আর তেমন ক্ষিধে নেই। তাই তারা স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লেখানোর জন্য দলে দলে ছুটে আসে। পায়ে চলা মানুষের ভিড় পথে, তারা খুব ঘরমুখী। ট্রেন বন্ধ। বাসে ওঠা যাচ্ছে না, বেজায় ভিড়। গরমে বাসে চড়ার চেয়ে হেটে যেতেই অনেকে স্বাচ্ছন্দবোধ করছে। মানুষ, এতো যে মানুষ! অগণিত মানুষ। কতো রকমের মানুষ। মানুষের আরাম-আয়াশে ভোগ-বিলাসের জন্য কতো না আয়োজন, কতো সমারোহ। মানুষ আরামে থাকতে চায়। মানুষ শান্তি পেতে চায়। ছাদে দাড়িয়ে দেখলাম, অন্যান্য ছাদেও মানুষ। এ দেশে নিয়ম নেই ছাদে ওঠার। কেন নেই?

ছাদের সান্ধ্য ভ্রমণ একটি আরামদায়ক স্বস্তিকর অনুভূতি। বাংলাদেশে ছাদের ওপর কতোজন বাগান করে ফুলের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। আমেরিকার বাড়ির ছাদগুলোই তো ত্রিকোণ। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ছাদগুলো সমতল হলেও নানান ঝক্কি। সুপারের হম্বিতম্বি নোটিশ। ছাদে না ওঠার নোটিশ। কোনোদিন নিউ ইয়র্ক শহরে আকাশে তারা দেখা যায় না। অবশ্য চাদের আলোয় ভেসে যায় সব। চাদ খুব কাছে। তাই আলো ঢালে। তারা থাকে দূরে, অনেক দূরে। জ্বলে মিটি মিটি।

নিউ ইয়র্ক শহরে এতো আলোর বন্যা। এ কারণে দূর আকাশে মিটি মিটি তারাদের দেখা যায় না। আজ দেখা গেল। অনেক তারা। তারা ভরা আকাশ, নাকি আকাশ ভরা তারা? মনটা কাব্যিক হয়ে যায়। মনটা শ্রাবণ রাতের বৃষ্টির মতো নরম হয়ে যায়।

বাংলাদেশের মানুষেরা নিউ ইয়র্কে দিব্যি আছে। ভালো–মন্দে মিলিয়ে আনন্দ, হাসি–বেদনায় কেটে যাচ্ছে। জীবন সবারই একটা গোছানো ভাব। এই দেশটা পর নয়, পায়ের তলার মাটিও দূরের নয়।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এলো। যদি এমন হয় তাহলে কেমন হয়! আমেরিকায় এমন একটি আবহাওয়া এলো বা বায়ু দূষণ শুরু হলো নিঃশ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। বাতাস বিষাক্ত, পানি পান করা যাচ্ছে না, পানিতে বিষ। সরকারিভাবে ঘোষণা দেয়া হলো, বাচতে চাইলে যার যার দেশে চলে যাও কিংবা অন্য কোনো দেশে আশ্রয় নাও। অনেকেরই নিজের দেশ বলতে আমেরিকাই। চার পুরুষ, পাচ পুরুষ ধরে তারা আমেরিকাতেই আছে। তারা বেছে নিচ্ছে ইওরোপের অন্য কোনো দেশ। চায়নিজরা সংখ্যায় এশিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এ দেশে। তাদের নিজের দেশেও কিলবিলে মানুষ। বাধ্যতামূলকভাবে তারা একটি সন্তানের জনক–জননী হতে পারে। দুটি হলেই সরকারকে জরিমানা দিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ আর ইনডিয়া এবং মানুষ নামের আদম–হাওয়ার অভাব নেই। জাপানিজরা এতো বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তারা পরের দেশে কমই থাকে।

এখন যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা থেকে প্লেনের পেট ভর্তি করে বাংলাদেশি মানুষ দেশের পথে রওনা দেয়? প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ দেশে ফিরছে, ফিরতে বাধ্য হচ্ছে। যেখানে প্রাণ বাচে না সেখানে থাকার প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশ বুক পেতে দাড়িয়ে বলছে কি। আয় আয় বুকে আয়। না, বাংলাদেশ চায় না প্রবাসীরা ফিরে আসুক। থাকবে কোথায় তারা। বাহ অন্যরা যেমন থাকে। অন্যদের বাসস্থান আছে, চাকরি আছে, জীবনকে গতিময় করার ব্যবস্থা তারা করে নিয়েছে। যারা চাকরি পায় না তারাও একটা কিছু তো করে। হোক সেটা চাদাবাজ বা সন্ত্রাসী, হোক সেটা মাস্তানি। করছে তারা কিছু না কিছু। আমেরিকা ফেরত মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিরা করবেটা কি?

শ্রমজীবী মানুষেরা শ্রমের ঘাম ঝরিয়ে আমেরিকায় স্বাচ্ছন্দময় একটা জীবন তো পেয়েছে। তারা কি দেশে গিয়ে পারবে না রাস্তায় ফল বিক্রি করতে? পারবে না ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে আলু, স্যান্ডউইচ ভাজতে? পারবে না ট্যাকসি চালাতে? পারবে না সিকিউরিটি জব করতে? পারবে না ডে–কেয়ারগুলোতে বাচ্চা লালন–পালন করতে? যারা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ছিলেন, বড় বড় অফিসের আমলা ছিলেন, যারা স্কলারশিপ নিয়ে এসেছিলেন ডক্টরেট করতে তারা অনেকেই তো ফিরে যাননি। এসেছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ আরো নানান ধরনের কতো বিদ্যাধর গুণী ব্যক্তি। তারাও তো আমেরিকায় উপরোক্ত কাজগুলো হাসিমুখেই করে গেছেন।

আমেরিকা স্বাধীন দেশ। স্বাধীনভাবে যার যার ইচ্ছা মতো কাজ করে জীবন ধারণ করা গেছে। এখন তো দেয়ালে পিঠ ঠেকেই গেছে। যার যার সঞ্চয় নিয়ে দেশে ফেরো। পড়ে থাকবে বাড়ি–গাড়ি, যার যার সাজানো সংসার।

ছেলেমেয়ে বা সন্তানদের নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করার কথা বাংলাদেশে ভাবা যায় না। সেখানে তীব্র প্রতিযোগিতা। টাকা ছড়ানোর প্রতিযোগিতা। সেখানে একজন আরেকজনকে টেক্কা দেয়ার প্রতিযোগিতা। আমিও বিমানে উঠলাম। চলে যাচ্ছি দেশে। দুটি সুটকেস নিয়ে অন্য সবার মতো আমি এলেও আমাদের সংসার এখন দুইশ সুটকেসেও ঢোকানো সম্ভব নয়। জীবন নিয়ে পালাতে গেলে এতো কিছু নেয়ার সময় কোথায়? আমরা দ্রুত ছুটছি। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

একটু মুক্তবাতাসের অন্বেষণে দৌড়াচ্ছি। জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি–তে এটম বোমা ফাটিয়েছিল। আমেরিকানরা এর পাল্টা জবাব আমেরিকাকে কোনো না কোনোভাবে পেতে হবেই তো। নাকি জাপানিজরা পার্ল হারবার ধ্বংস করেছিল বলেই আমেরিকা পৃথিবীর প্রথম এটম বোমা ফাটিয়েছিল জাপানে। ধ্বংসের বদলে ধ্বংস, মৃত্যুর বদলে মৃত্যু।

দৌড়ে ছুটে গিয়ে বিমানে বসলাম। নিউ ইয়র্ক পুড়ছে। দাউ দাউ আগুনের শিখা। বিমান এক ঝটকায় আকাশে উড়লো। দক্ষ পাইলট বিমান চালাচ্ছে দ্রুত। আমরা যাচ্ছি নিরাপদ জীবনের সন্ধানে। একবার বিদেশের জল হাওয়া শরীরে লাগলে সে শরীর আর দেশের দিকে ধাবিত হতে চায় না। সে এখন সন্ধান করে অন্য দেশের যে দেশে জীবন সচ্ছল হয়। পৃথিবীর চেহারাই আমূল পাল্টে গেছে। বাধ্য হচ্ছে মানুষ যার যার দেশমুখী হতে। না চাইলেও যেতে হচ্ছে।

বাংলাদেশে অগণিত মানুষের সঙ্গে আরো পনেরো বিশ লাখ মানুষ যদি সংযুক্ত হয়? তাহলে অবস্থাটা কেমন দাড়ায়!

নাহ এসব আমি কি ভাবছি? কিছুই তো হয়নি নিউ ইয়র্কে। শুধু বিদ্যুৎ নেই। এ কারণে আলো জ্বলছে না। বিদ্যুৎ এসে যাবে। এটা কোনো দুর্যোগ নয়। ঝড়, তুফান, সাইক্লোন, ভূমিকম্প কিছুই হয়নি। কেউ শত্রুতা করে এটম বোমার চেয়েও মারাত্মক কিছু ফাটায়নি। সব ঠিক আছে, আগের মতোই। গরম নিয়ে হই চই করার কি আছে! সকাল নয়টায় বিদ্যুৎ এসে গেল আমাদের পাড়ায়। টেলিভিশনের পর্দায় শুধু নিউজ আর নিউজ। পয়ষট্টি ভাগ বিদ্যুৎ এলো বিকাল নাগাদ। সন্ধ্যার পর পচাশি ভাগ। রাতে ঘোষণা এলো নিউ ইয়র্কের পাচটি বরো–তেই বিদ্যুৎ এসে গেছে। আবার ঝলমলে শহর হয়ে গেল নিউ ইয়র্ক। ব্ল্যাক আউটের অবসান। শুক্রবার সবাই ছুটি উপভোগ করার অবকাশ পেল।

এ একদিনেই আমেরিকার অর্থনীতিতে কিছুটা হলেও ধাক্কা দেবে। ব্যবসা চলেনি। আমদানি–রফতানি ছিল না। প্লেন ডিলে করা হয়েছে। কোনো প্রাণক্ষয় হয়নি। আগুন লেগেছিল কোথাও কোথাও। ফায়ার বৃগেডের গাড়ি ছুটে গিয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে।

একদিনের স্থবির শহরটি দেখার জন্য বাইরে এলাম। শুক্রবার দোকানপাট সব বন্ধ। শুধু গ্রোসারিগুলো খোলা। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। এ কোন শহর! যেন অন্য এক অচেনা শহর। ম্যানহাটান, কুইন্স যেখানেই গেছি সব যেন নীরব। রাস্তায় গাড়ির স্রোত। মানুষ যাচ্ছে যার যার গন্তব্যে। আমেরিকার আরো একটি ইতিহাসকে কাছ থেকে দেখলাম। আবার হয়তো কুড়ি বছর পর, ত্রিশ বছর পর এমন ব্ল্যাক আউট হতেও পারে। যা এ দেশে সচরাচর হয় না। হঠাৎ হলে কেমন কাপিয়ে দিয়ে যায় মানুষের জীবন। যাই দেখলাম, অনুভব করলাম, আমরা বাংলাদেশের কষ্ট সহিষ্ণু মানুষেরা বিদ্যুৎ বিভ্রাট এতো বেশি দেখে অভ্যস্ত, এগুলোতে আমাদের কাছে তুচ্ছ, অতি নগন্য। যাক, নিউ ইয়র্ক আবার জীবন ফিরে পেয়েছে। সেটাই স্বস্তি।

নিউ ইয়র্ক থেকে

প্রথম দর্শন

– মোহাম্মদ আর ইসলাম

১৯৯৮ সালের শুরুর দিকের ঘটনা। প্রথমবারের মতো ব্রুকলিন থেকে কুইন্স–এর ৭৪ জ্যাকসন হাইটস–এর রুজভেল্ট এভিনিউতে যাচ্ছি। এটি ছিল আমার প্রথম জ্যাকসন হাইটস যাত্রা। এক ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার নতুন কিছু দেখার প্রচণ্ড অস্থিরতা।

নিউ ইয়র্ক আসার পর সবার মুখ থেকে শুনে আসছি জ্যাকসন হাইটস–এর কথা। পরিচিত যার সঙ্গেই দেখা হয়, যে বিষয় নিয়েই কথা বলি তা শেষ পর্যন্ত গড়ায় জ্যাকসন হাইটস–এ। দেশি খাবার খেতে চাই (হাজির বিরিয়ানি, আলাউদ্দিনের মিষ্টি, পদ্মার ইলিশ) যাওয়া চাই জ্যাকসন হাইটস। দেশি পোশাক (আড়ং), দেশি অডিও, ভিডিও, দেশি গল্পের বই (মুক্তধারা) সব কিছুর জন্য জ্যাকসন হাইটস।

সর্বোপরি জ্যাকসন হাইটস ভিত্তিক *দেশি* শব্দটি দেশের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র উপমহাদেশ পর্যন্ত ব্যপ্ত। উপমহাদেশের খাবার, পোশাক, ভাষা, চলচ্চিত্র সব কিছু প্রকাশ পায় দেশি হিসেবে। নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক উপমহাদেশের বিরাট জনগোষ্ঠির বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে জ্যাকসন হাইটস।

তাই এই জ্যাকসন হাইটস দেখার আগ্রহ আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড কিছু মিস করছি। এক রবিবারে সবওয়ের ম্যাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি জ্যাকসন হাইটস–এর উদ্দেশ্যে।

দিনটি রবিবার থাকায় ট্রেনে যাত্রী ছিল প্রচুর। হঠাৎ আমার অবস্থান থেকে একটু দূরে একটি নারী কণ্ঠ ভেসে আসছিল। শব্দের উৎস ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই দেখলাম একজন শ্বেতাঙ্গ নারী ও একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সবার মাঝে দাড়িয়ে। তাদের দুজনের গলায় ঝোলানো কার্ডবোর্ডের কাগজে লেখা *হোমলেস, এইচআইভি পজিটিভ প্লিজ হেলপ।* একটু মনোযোগ দিয়ে যা বুঝলাম তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

মহিলা বলে যাচ্ছেন, *ভদ্রমহিলা ও ভদ্রপুরুষরা। আমি এবং আমার স্বামী অত্যন্ত দুঃখিত যাত্রাপথে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য। কিন্তু আমরা যা করছি তা অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে করছি। কারণ আমার স্বামী ও আমি দুইজনেই এইচআইভি আক্রান্ত। তাই আমরা আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। যদি আপনাদের সম্ভব হয় তবে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছি।*

মহিলা কথা বলছিলেন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে।

অবাক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কারণ যদিও ১৯৯৮ সালের বহু আগে থেকেই আমি এইচআইভি রোগের সঙ্গে পরিচিত। তবুও এর আগে ব্যক্তিগতভাবে কোনো এইচআইভি রোগী দেখিনি। তাই যখন আমি এতো কাছ থেকে কাউকে দেখছিলাম তখন প্রায় অবিশ্বাস মনে হচ্ছিল।

অবাক হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো আমি জানি যারা সাবওয়ে ও অন্য স্থানে ভিক্ষা করে তারা সাধারণত কালো। ড্রাগ আসক্ত স্প্যানিশ লোকজন যাদের পরনে থাকে অতি ময়লা পোশাক এবং গায়ে থাকে ভীষণ বাজে গন্ধ। কিন্তু এই জুটি প্রচলিত ধারণা থেকে ব্যতিক্রম। অবশ্য তাদের পরনের পোশাকও ছিল অনেক পুরনো। দুজনের মধ্যে পুরুষটিকে অনেক বেশি দুর্বল মনে হচ্ছিল। সম্ভবত এডভান্স স্টেজ–এ।

মহিলা তার কথা শেষ করে সবার কাছ থেকে টাকা–পয়সা সংগ্রহ করতে করতে এক পর্যায়ে আমার খুব কাছে চলে এসেছিল। আমি পুরো সময় এক দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখে যাচ্ছিলাম। পরবর্তী স্টেশনে তারা নেমে পড়ে। খানিক পরেই ৭৪ রুজভেল্ট এভিনিউ চলে এলে আমি নেমে পড়ি। কিন্তু এখনো যখন আমি এইচআইভি, এইডস সংক্রান্ত কোনো কিছু পড়ি ও দেখি তখন আমার অজান্তে সব সময় সেই দুটি মুখ ভেসে ওঠে।

islam11219@yahoo.com

ভাগ্য

– মোহাম্মদ কায়েমুজ্জামান

এ কাহিনী আমার না, আমার গ্রামের বাড়ির পাশে একজনের মুখে শোনা।

তিনি যখন মধ্যেপ্রাচ্য অর্থাৎ সউদি আরব থেকে এলেন তখন দেখে মনে হলো, বিদেশ থেকে তিনি অনেক মোটা হয়ে গেছেন। প্রবাসী জীবন কেমন কাটলো এটা যখন তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি এড়িয়ে যেতে লাগলেন। তার এ এড়িয়ে যাওয়াতে আমার কৌতূহল জাগে। এতে বাধ্য হয়ে তার সমবয়সী অন্য লোকের কাছে যা জানলাম তাতে আমার চোখের পানি এসে গেল।

তিনি যখন আমার চাপাচাপিতে বলতে শুরু করলেন তখন আমার মন কেদে উঠলো। তার ছয় ছেলেমেয়ে। বিদেশ যাবার আগে শুধু বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যান। তখন আরো তিনটি মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু টাকার অভাবে বিয়ে দিতে পারছিলেন না। এমন সময় এক দালাল তাকে বিদেশ যাবার জন্য লোভ দেখায়।

বিদেশ যেতে পারলে অনেক টাকা হবে। সংসারে সচ্ছলতা আসবে। মেয়ের বিয়ে ভালো জায়গায় হবে।

কিন্তু টাকা! সামান্য দুই বিঘা ধানী জমি আছে তাতে কোনো রকম খাওয়া চলে। কারণ নিজে খেটে অন্যের জমি বরগা চাষ করেন। তবে বিদেশ যেতে অনেক টাকা লাগবে। এদিকে বিদেশ যাওয়ার লোভ বেড়ে যায় দালালের গালগল্পে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমি বিক্রি করে দেন দেড় বিঘা আর বাড়ির দুধেল গাভী। তারপর বিদেশ যাবার দিনক্ষণ পড়লো।

প্রথমে ঢাকায় গেলেন বিমান ফ্লাইট তারিখ মোতাবেক। কিন্তু কিছুদিন থাকার পর সে ফ্লাইট বাতিল হলো। পনেরো দিন ঢাকায় থেকে কিছু টাকা খরচ করার পর আবার বাড়ি, আবার অপেক্ষা। এদিকে কোনো চাষ করতে পারছে না, কখন আবার বিদেশ যাবার ডেট পড়ে। অপেক্ষা করে তিন মাস পরে আবার ডেট হলো। কিন্তু এবার আবার ফিরে আসতে হলো। তবে যারা যাচ্ছে তারা অধিকাংশ মধ্য বয়স্ক, বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে। বেশির ভাগ তারা গরিব বলা চলে। কারো বাপের তেমন কোনো জমিজমা নেই যে, চাষ করলে বছরের খাবার হয়ে যাবে।

পনেরো দিন পর দালাল এসে বললো, এখনই ঢাকায় যেতে হবে। যে কথা সেই কাজ। যতো দ্রুত সম্ভব টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় গোছগাছ করে সেদিনই রওনা হলেন তিনি। তার নাম নওশের। তাকে নওশেরভাই বলে ডাকি। এটা ১৯৯৪ সালের ঘটনা।

তারা গিয়ে পাচ ছয়জন একটি নিম্নমানের হোটেলে ওঠে। এর ভেতর দুইজন বিদেশ চলে যায়। কিন্তু তখনো নওশেরভাইয়ের ফ্লাইট হয়নি। বিদেশি দালালদের সঙ্গে দেশি দালালের চুক্তি হয়। সে মোতাবেক তারা লোক পাচার করে। এটা হলো টুরিস্ট ভিসা।

নওশেরভাই বলা শুরু করলেন, আমি আট দশ দিন থাকার পর অস্থির হয়ে পড়লাম। দালাল থাকে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে এক বাসায়। খোজ নেয়ার জন্য এয়ারপোর্টে গেলাম। সঙ্গে কোনো কাপড়-চোপড় নিইনি। সবই হোটেলে। পকেটে তখন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। হোটেলে দশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছি। আসলে হোটেল থেকে বের হই একটু হাটবো বলে। কিন্তু কি মনে হলো ওই অবস্থায় ট্যাকসি ভাড়া করে দালালের খোজে এয়ারপোর্টে আসি। ট্যাকসি ড্রাইভারকে দাড় করিয়ে রেখে ভেতরে যাই খোজ নেয়ার জন্য। গিয়ে যা শুনলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।

বিদেশ যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাই সব আশা ছেড়ে ট্যাকসি ভাড়া না দিয়ে বসে থাকলাম। ভাবলাম ট্যাকসি ড্রাইভার কিছু সময় দাড়িয়ে থেকে চলে যাবে। পাচ তলার উপর থেকে তাকিয়ে দেখলাম, আধঘণ্টা অপেক্ষা করে মনে হয় আমাকে গাল দিতে দিতে চলে গেল।

আমার ফ্লাইট তখন আধঘণ্টা বাকি। পকেটে হাতড়ে একটি লাইট এবং এক প্যাকেট আজিজ বিড়ি পেলাম। খুব আজিজ বিড়ি খেতাম। বিদেশ যাবার সময় সম্বল মাত্র এই। গায়ে শার্ট, প্যান্ট আর পায়ে জুতা, পকেটে পঞ্চাশটি টাকা। ট্যাকসি ভাড়া দিলে থাকলো ত্রিশ টাকা। বাধ্য হয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

ভাবলাম, বিদেশ যাবার পর দালালরা সব পৌছে দেবে বলেছে, তখন আর ভাবনা কি! বার বার কান্না পেল। হাতে এতো টাকা থাকতে টাকা নিতে পারছি না। পাচ বছর থাকার জন্য অনেকগুলো কাপড় বানিয়েছি। তারও একটি নিতে পারছি না শুধু দালালদের অসতর্কতার কারণে।

ঠিক সময় বিমানে চড়লাম। যাবার আগে টাকা ভাঙিয়ে এক ডলার পেলাম। রাতে খেলাম না। ঠিক করলাম পৌছে খাবো। দালালরা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সঙ্গে কোনো কিছু নিতে পারলাম না বলে মনে মনে অনেক কাদলাম। তখনো আশা ছিল ওই টাকা এবং কাপড়গুলো পাবো। কিন্তু নিয়তি! যদি দেড় ঘণ্টাও সময়

থাকতো তাহলে এগুলো আনতে পারতাম। তখন মাত্র সময় ছিল একঘণ্টা। হোটেল থেকে ঘুরে আসতে জ্যাম না থাকলে লাগে আধঘণ্টা। বাধ্য হয়ে যেতে পারিনি।

তারপর সেই এক ডলার প্রথম দিন খরচ করলাম। কারণ প্রথম দিন একবার খাবার দিল দালালরা। আর এক রুমে চারজন করে থাকলাম। পরের দিনও একবার খাবার দিল। প্রতিদিন একবারের বেশি খাবার দেয় না। না খেয়ে বাড়ির কথা তখন বেশি করে মনে আসতে লাগলো। ভালোই ছিলাম বাড়িতে এই বিদেশ–বিভূইয়ে না খেয়ে মরার চেয়ে।

জানি, আমার মতো সন্তানেরা না খেয়ে বসে আছে আমার দিকে তাকিয়ে। বিদেশ থেকে টাকা পাঠাবো, তারপর তাদের পেট ভরে খাবার সুযোগ হবে। ছয় দিনের মাথায় কাজ পেলাম পেটে–ভাতে। যাহোক, অভুক্ত পেট, খাওয়ার জন্যই কাজে লেগে গেলাম। করার কিছুই ছিল না। তখন একমাত্র পথ দুমুঠো খেয়ে বাচা।

মাস খানেকের ভেতর এক বাঙালির সহায়তায় রিয়াদ থেকে ছয়শ মাইল পশ্চিমে এক শহরে কাজ পেলাম। সেই প্রথম দেড়মাস পরে বেতনভোগী হলাম। কিন্তু বিপদ। শীতের কাপড় যা যোগাড় করেছিলাম তাতে হলো না। এমন শীত জীবনে দেখিনি। পায়ের তলে শান বরফের মতো ঠাণ্ডা। তাও আবার দুটো কম্বল। একটা বিছানো, একটা গায়ে। সমস্ত ভারী কাপড় পরে এবং শার্ট, গেঞ্জি পরেও ঘুমাতে পারলাম না শীতে সারা রাত। আবার ভোরে শীতের ভেতর কাজ।

ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে গেল পাচ দিনেই। ছয় দিনের দিন আবার ফিরে এলাম রিয়াদে। বাঙালিদের সহায়তায় চাকরি পেলাম অল্পদিনের ভেতর। এর ভেতর যতো খাওয়া–দাওয়া, শীতের পোশাক সব বাঙালিরা যোগাড় করে দিল। সেই থেকে দালালদের আর দেখা পেলাম না। কিন্তু একজন বাঙালির প্রতি আরেকজন বাঙালির এমন ভালোবাসা আর কখনো দেখিনি। আমরা চুরি করে থাকতাম। পুলিশের ভয় সব জায়গায়। যাক, চাকরি হলো ভালো বেতনে। প্রায় দুই মাস পর একটু টাকা হাতে আসবে মনে করে খুশি হলাম।

এর ভেতর পুলিশের ভয়ও আছে। বাইরে বের হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। তারপর সুযোগ মতো এক ফলের দোকানে চাকরি নিলাম ভালো বেতনে। বাড়িতে টাকা পাঠালাম। কিছুদিন পর হজের সময় এলে হজ করলাম।

বিপদ হলো, আবার পরবর্তী হজের পর সে বছর কিছু বাঙালি হজ করে আর ফিরে আসেনি। তারা অবৈধভাবে থাকে। তাদের খোজে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারি পুলিশ অভিযান চালাতে লাগলো। আমরা যে মার্কেটে চাকরি করতাম তার সঙ্গে ছিল থাকার জন্য বাসা। এ অঞ্চলেই বেশি বাঙালি থাকতো। এর অধিকাংশ ছিল অবৈধ ইমিগ্রান্ট।

মার্কেটে গেট বন্ধ করে সার্চ শুরু করলো। তখন সকালবেলা। একজন এসে যখন এ কথা বললো তখন করার কিছুই নেই। কি করবো! এর সঙ্গে সমস্ত অবৈধ লোক ধরবে এবং জেলে পাঠাবে, তারপর বিচার। কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। বাসায় বসে থাকলাম। একজন বললো, বাসায় থাকলে ধরবে না।

ডিউটির টাইম হয়ে যাওয়ায় মালিক লোক পাঠালো দোকানে যাবার জন্য। বলা হলো, পুলিশ নেই, চলে গেছে। সত্য। দেখি পুলিশ চলে গেছে। কিন্তু ঠিক বারোটার দিকে আবার সার্চ শুরু হলো। আগের রাতে ঘুমের ভেতর একটি খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম। এ জন্য ভাবলাম আর রক্ষা নেই। ফলে যতো টাকা সঙ্গে ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় তখন সত্তর হাজার টাকা ছিল, সব কাছে নিলাম।

ধরা পড়ার পর আমাদের হাজতে পাঠানো হলো। রিমান্ডে নেয়া হলো। সেই হাজতে তদারকির দায়িত্ব ছিল এক বাঙালির। সে বুঝতে পারছিল আমাদের প্রত্যেকের কাছে মোটা অংকের টাকা আছে। ভয় দেখিয়ে এবং জোর করে টাকাগুলো নিল। আমার কাছে শুধু শার্ট–প্যান্ট, সোয়েটার আর এক জোড়া জুতা। টাকা তখন সেই বাঙালি তদারকির লোকের হাতে।

সউদি আরবের পুলিশ কোনোদিন আমাদের কাছ থেকে টাকা নেবে না। এটা জেনেই টাকাগুলো সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম, সেটা হারালাম। মনে পড়ে গেল, বিদেশ আসার সেই ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

তিন মাস রিমান্ডে কাটালাম। স্বাস্থ্য, শরীর ভালো হয়েছিল, সব গেল। শরীরের যে অবস্থা হলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খাবার দেয় ঠিকই কিন্তু কিছু বাঙালির জন্য সে খাবার পাওয়া যেতো না।

হাটা চলা বন্ধ হয়ে গেল। মারের কারণে শরীর, হাত, পা ফুলে মোটা হলো। বাড়ি চলে এলাম। মানুষ মনে করলো আমি অতিরিক্ত মোটা হয়েছি। কিন্তু তখনো ঠিক মতো হাটতে পারতাম না। তখন সারা দিন কাদতাম। বাড়ি এসে ঘর থেকে বের হতাম না লজ্জায়, ঘৃণায়।

রাজশাহী থেকে

জীবন যে রকম

– তৌহিদা ফারুক

বিশ্বের মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র দুটি নাম মক্কা ও মদিনা। অন্তরের টানে সবাই ছুটে আসেন এখানে। সউদি আরব পেট্রডলারের দেশ। তাই সেই সোনার হরিণের নাগাল পেতেও অনেকে ঘরবাড়ি, ব্যবসা, জমি বিক্রি করে ছুটে আসেন এ দেশে।

পবিত্র কাবা শরিফের অদূরে অবস্থিত হোটেল কাকি-র বেলবয় বেলালও তেমনি সোনার হরিণ ধরতে এসেছিলেন এ দেশে। মাত্র তিনশ রিয়ালে মরুভূমির মধ্যে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করতে গিয়ে তার স্বপ্নভঙ্গ হলো। জনমানবহীন জায়গা, প্রচণ্ড গরম, থাকা-খাওয়ার ভীষণ কষ্ট তাকে পাগলপ্রায় করে তুললো। আদম ব্যাপারীর হাতে প্রতারিত বেলালের দেশে ফেরারও পথ ছিল না। সব বিক্রি করে টাকা দিয়ে তিন বছরের চুক্তিতে তিনি এ দেশে এসেছেন।

এক বছর এই অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগের সঙ্গে তার দেখা হয়। হোটেলের জন্য ইংরেজি জানা লোক খুজছিলেন তিনি। বেলালকে দেখে তার ভালো লাগে। সউদি কফিলকে (বেলালের স্থানীয় মালিক) টাকা দিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনে তিনি এই হোটেলে চাকরি দেন।

বেতন একই। তবে টাকা-পয়সার চেয়ে থাকা-খাওয়াটা আরামদায়ক আর টিপস-এর সুবিধাও আছে। বেলাল এরই মধ্যে দেশের ধার শোধ করেছেন। টাকা-পয়সা আরো কিছু জমা হলে দেশে যাবেন মাকে দেখতে। এই অনাগত দিনের খুশিতে সদাব্যস্ত বেলালের চোখে-মুখে হাসির ছটা লেগে থাকে।

জেদ্দা এয়ারপোর্টে দেখা হলো দাল্লা (ঝাড়ুদার) রাশিদের সঙ্গে। বারো বছর এখানে আছে। চোস্ত পোশাক, অনর্গল আরবি কথা, ধমক-ধামক শুনে মনে হচ্ছিল অন্য দেশি কেউ হবে হয়তো। কিন্তু কাছে এসে বাংলা কথা শুনে হাসিমুখে এগিয়ে এলে বোঝা গেল বাঙালি। চট্টগ্রামে বাড়ি। খুবই গরিব তারা। পনেরো বয়সে আত্মীয়ের হাত ধরে বিদেশে পাড়ি। প্রথম বছর খানেক কান্নাকাটি। তারপর ধীরে ধীরে মন বসে গেছে। কঠোর পরিশ্রমের কাজ। মাঝে মধ্যে আঠারো বিশ ঘণ্টাও কাজ করতে হয়। তবুও রাশিদ তার মুখের হাসি ম্লান হতে দেয় না। এর সুফল সে পেয়েছে।

তার মালিক সউদি শেখ তার ওপর খুব খুশি। আদর করে তাকে নানান জিনিস দেয়। বিশ্বাস করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও দেয়। ভূগর্ভস্থ কমপিউটার রুম পর্যন্ত তার যাতায়াত যেখানে আর কারো যাওয়ার অধিকার নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান এলে অভ্যর্থনার লাল কার্পেট পাতার দায়িত্ব তার ওপরই পড়ে। গড় গড় করে এক

ডজন রাষ্ট্রপ্রধানের নাম ও চেহারার বর্ণনাও সে দিল আমাদের কাছে। মা ও বাবাসহ বাড়ির অনেককেই হজ করিয়েছে সে। মা ও বাবা এখন তার কাছেই থাকেন।

দেশ থেকে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনদের এনে সে এখানে কাজে লাগিয়েছে। এক কথায় জেদ্দা এয়ারপোর্টের বাঙালি কমিউনিটির সে নেতা। বললো, দোয়া করবেন যেন বিদেশে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারি আর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে কাজ করে যেতে পারি।

এর পাশাপাশি আমিনা বাঙ্গ-এর কথা মনে পড়ে। মুলতানের অধিবাসী এই মহিলার সঙ্গে মসজিদে নব্বীতে দেখা। শুক্রবারে সকাল দশটায় মহিলাদের জেয়ারত-এর জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রচণ্ড ভিড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি দেখে নিজেই এগিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে রওজা মোবারক ও রিয়াজুল জান্নাতে নিয়ে গেলেন। সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন সাহাবীরা কে কোথায় বসে ইবাদত করতেন, মহানবী কোথায় দাড়িয়ে খোতবা দিতেন।

অজ্ঞাত পরিচয় এই মহিলার আন্তরিকতায় *বেহেশতের টুকরায়* নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হলো।

জেয়ারত শেষে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। বললেন, এই পবিত্র স্থানে এসে তিনি সব কিছু ভুলে গেছেন। পরে সামান্য যা কিছু বললেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। মুলতানের প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দা এই মহিলার পাচ বছরে বিয়ে হয়। আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ের চার বছর পরই বিধবা হন তিনি। প্রথমে এ বাড়ি সে বাড়ি ঝির কাজ। পরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবার হজ করতে এ দেশে আসার সময় বাচ্চার আয়া হিসেবে তাকেও নিয়ে আসেন। আজন্ম লালিত স্বপ্ন এভাবে পূরণ হওয়ায় খুশিতে অস্থির হয়ে যান তিনি। কিন্তু এ দেশে এসে রওজা মোবারক ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা তাকে অধীর করে তুললো। বহু অনুরোধ, উপরোধ শেষে পাকিস্তানি মালিক তাকে এক সউদি শেখের বাড়ি পরিচারিকা রূপে রেখে দেশে ফিরে যান। অশিক্ষিত, গ্রাম্য এই মহিলা বারো বছর সেই শেখের বাড়িতে তার স্ত্রীর পরিচারিকা রূপে কাজ করেছেন।

তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তার মনিব তাকে আজাদ করে দেন এবং তারই বাড়ির একাংশে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি আজ প্রায় পয়ত্রিশ বছর এ দেশে আছেন। তিনি সামান্য তিন চার ঘণ্টা সময় সেলাই ও অন্য কাজ করে জীবনধারণের জন্য অর্থ জোগাড় করেন। অবশিষ্ট সময় মসজিদে নব্বীতে পড়ে থাকেন। তার মনে কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই। আল্লাহ তার সব বাসনাই পূর্ণ করেছেন।

আল্লাহর কাছে নিবেদিত প্রাণে কিছু চাইলে তিনি তা পূরণ করেন, আমিনা বাঙ্গ-এর এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনকে ছুয়ে যায়। তথাকথিত ধর্মবেত্তাদের তুলনায় কি অপরিসীম নির্ভরতা তার আল্লাহর প্রতি। তার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল।

গাজীপুর থেকে

বেদনার অতীত

– রেশমী

আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে কেবলই কান্না পাচ্ছে। তারপরও মনে হচ্ছে হয়তো কিছুটা হালকা হওয়া যাবে। মা অসুস্থ ছিলেন। চিঠি লেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বার বার আমাকে অনুরোধ করছিলেন কুয়েতে একটা চিঠি লেখো, আমার কথা জানিয়ে আমার কলিজার কাছে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস চিঠির উত্তর আসতে না আসতেই মা আমার এ ধরনী ছেড়ে চলে গেলেন সুদূরে। শোকে বিহ্বল হয়ে কিছুদিন পর বাবাও...।

বছর শেষে ভাইয়া জানালো, আমি আসছি। তোরা আর কাদিস না।

ভাইয়াকে পেয়ে মা-বাবা হারানোর বেদনা সাময়িক ভাবে কিছুটা ভুলে গেলাম। ভাবীকে তুলে আনাতে বাড়িটা কিছুটা আনন্দ মুখর হলো। সংসারের কথা ভেবে হাতে ছুটি থাকতেই মাত্র দেড় মাসের মাথায় ভাইয়া প্রবাসে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এয়ারপোর্টে পৌছাতে মাত্র পাচ কিলোমিটার বাকি তখনই ভাইয়া একসিডেন্টে মারা গেল।

সে থেকেই আমরা একা, ভীষণ একা। সামান্যতেই বুকটা কেপে উঠে।

বছর দুই পর হঠাৎ একদিন পিয়ন হাতটা বাড়িয়ে বললো, সউদি থেকে এসেছে আপনার চিঠি। প্রথমত খানিকটা অবাক হলেও খুলে পড়ে বুঝতে অসুবিধা হলো না ইনকিলাবের কইনচেন দেহি বিভাগ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে সাহেব লিখেছেন।

একাকী জীবনের অবসান ঘটাতে সেই থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। বর্তমানে প্রেমিকা থেকে অলিখিত স্বামী-স্ত্রীও হয়ে গিয়েছি। জানি না ভুল করলাম কিনা।

এখন আমার রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে তার প্রতীক্ষায়। একজন ধার্মিক যেমন পবিত্র ধর্মগ্রন্থে গভীরভাবে বিশ্বাস করে ঠিক তেমনি ভাবে আমিও বিশ্বাস অর্পণ করে আসছি আমার প্রতি তার গভীর ভালাবাসায়।

জানি না দুটি দেহ কবে হবে একটি হৃদয়, একটি কলেবর।

খুলনা থেকে

বিশ্বাস

– আবদুল্লাহ নাজমা

বিয়ের দুই বছর পর আমার স্বামী পড়াশোনার উদ্দেশ্যে গেলেন বিদেশে। কয়েক মাস পর তার কাছে এলাম। ভিসা, টিকেট, গরম কাপড় কেনার দৌড়াদৌড়ি, জীবনে প্রথম প্লেনে চড়া এবং বিদেশ যাত্রার টেনশন সব মিলিয়ে মহাব্যস্ত থাকলেও সারাক্ষণ বুকে বিধতো বিশাল এক শূল, হার্টের রোগী আম্মা। আমার দেখা পৃথিবীর সেরা মা। তাকে ছেড়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। আম্মা বুকে পাথর বেধে আমাকে হাসিমুখেই বিদায় দিলেন।

প্রচণ্ড মোশন সিকনেস আছে আমার। বাসে উঠলেই দুইটা অ্যাভোমিন লাগে। অথচ যারা বাসে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় তাদের কাছেও শুনলাম প্লেনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভালো না। নাক কান শুকিয়ে চৌচির। বড় দুলাভাইয়ের নাকি কান দিয়ে রক্তই বের হয়েছিল। ভয়ে আমি বাচি না। খারাপ লাগলেই মাথা নিচু করে হা করে শ্বাস নিতে হবে। নাক-কানে একটু ভেজলিন দিতে হবে, কানে রাখতে হবে তুলা। সুতরাং প্লেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কৌশল কাজে লাগিয়ে প্রাণপণে দোয়া পড়ছি। প্লেন রানওয়েতে দৌড়াচ্ছে, এখুনি উড়বে। চোখ বন্ধ করে ভায়াবহ একটা কিছুর অপেক্ষা করছি। হঠাৎ হালকা মনে হলো নিজেকে। এমা! একদম মনে হচ্ছে বাতাসে সাতার কাটছি। এ যে মনে হচ্ছে শুধু প্লেন নয়, আমিও উড়ছি। এই ওড়ার আনন্দ কোথায় রাখি, কাকে বলি! তারপর থেকে প্লেন দেখলেই আমার আকাশে উড়তে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সেটা কি শুধুই বাতাসে ওড়ার মজার জন্য, নাকি অন্য কিছু! প্লেন, বাস সব মিলিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে ইংল্যান্ডের সময় রাত বারোটায় পৌছালাম স্বামীর ভাড়া করা ফ্ল্যাটে। টানা ঘুমে পরদিন দুপুর। বিকেলে পাচ তলার জানালা দিয়ে তাকাই বাইরে। নীল আকাশে প্লেন যাচ্ছে লম্বা শাদা রেখা একে দিয়ে। এখন বাংলাদেশে রাত। আম্মা কি করছেন? হঠাৎ মনে হলো, এ আমি কোথায় এসেছি হাজার হাজার মাইল দূরে! উত্তর চাইলেই তো আর এখুনি দৌড়ে আম্মার কাছে যেতে পারবো না। হঠাৎ উপলব্ধি করলাম দূরত্বের জালে

আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে গেছি। মাথাটা ভো করে উঠলো। অতিরিক্ত মন খারাপ হলেও মনকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন কি তা মানে? চালু করলো তার নিজস্ব ডিফেন্সিভ মেকানিজম। শুরু হলো প্রতিদিন স্বপ্ন দেখা।

অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না যে, চার পাচ মাসে প্রায় প্রতিদিন আমার মা-বাবা, ভাই-বোনদের স্বপ্ন দেখেছি এবং সকালে তা স্পষ্ট মনে করতে পেরে যেন তাদের সঙ্গেই দেখা করে এলাম ভেবে একটু খুশিও হয়েছি। এখনো দেখি। তবে কম। কারণ ইতিমধ্যে অভাবিত এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে জীবনের অনেক পরিকল্পনাই ওলোট-পালোট হওয়ায় মন একটু অন্যমনস্ক হয়েছে বলেই বোধহয়।

এই শহরটা ইংল্যান্ডের সবচেয়ে গরিব এবং মোটামুটি নিরিবিলি। সূর্যালোকের অভাবে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া লম্বা লম্বা মানুষ ঘুরে বেড়ায়। আমাকে এরা চেনে না। আগে কখনো দেখেনি। তবু চোখে চোখ পড়লেই হাসে। দিনটা মেঘলা না হয়ে সূর্যলোকিত হলে আনন্দ প্রকাশ করে। মাঝে মধ্যে বিপরীত দিকে যাবার সময় হাস্য বিনিময়কারী মায়ের সঙ্গের বাচ্চারা টা টা পর্যন্ত দেয়। আবার চোখে মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে তোলার বিপরীত দৃশ্যও দেখি।

এখানে আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। লাখ লাখ বই। কতো ভাষার। অডিও ভিডিও। খুবই দুঃখের সঙ্গে দেখলাম বাংলা বই মাত্র একটা র‍্যাকে। তাও আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটাও বই নেই। তবু *নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো* ভেবে পড়া শুরু করতে না করতেই দেখি বই শেষ। তখন পেলাম সুযোগ। তাদের কাছে গিয়ে বললাম, তোমরা কবে নতুন বই কিনবে? আমার তো বাংলা বই পড়া শেষ, যে দুই একটা বাকি আছে সেগুলো আমার পছন্দ নয়।

তারা বললো, তুমি বইয়ের লিস্ট দিতে পারো।

আহা! এ সুযোগ ছাড়া যায় না। ঢাকায় হচ্ছে বই মেলা। ইন্টারনেট ঘেটে শুরু হলো লিস্ট তৈরি করা। বইয়ের মতো এখানে ইন্টারনেটও ফ্। আর এ সুযোগে প্রায় প্রতিদিনই অধীর আগ্রহে প্রথম আলো দেখি, মুহম্মদ জাফর ইকবারের একটা কিছু লেখা পাওয়া যায় কি না।

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে আমাকে মাঝে মধ্যে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা হলো, কেন তুমি মাথায় কাপড় দাও?

আমি তখন বলি, দেখো, আমার মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু আমার ধর্মীয় বই কোরআন শরিফের ভাষা আরবি। আমি আরবি ভাষা বুঝি না। তাই কোরআন শরিফের বাংলা অনুবাদ পড়ি। যখন থেকে কোরআন শরিফের বক্তব্য একটু বোঝা শুরু করেছি তখন থেকেই আমার মনে হয়, এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বই। এখনো এটাই মনে করি। এই কোরআন শরিফের একটা বাক্য পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, মাথায় কাপড় দেয়া আমার জন্য মঙ্গলজনক।

তারপর কোরআন শরিফের সুরা আহযাবের ঊনষাট নাম্বার আয়াতটা নিজের সাধ্যমতো ইংরেজিতে অনুবাদ করে বোঝানোর চেষ্টা করি। এরপর বলি, অবশ্য বাক্যটা (আয়াতটা) পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় কাপড় দেয়া শুরু করিনি। কারণ এতে অভ্যস্ত ছিলাম না। চিন্তা ভাবনা করে এক মাস পরে এ ব্যাপারে ডিসিশন নিই। সত্যি সত্যিই কোরআন শরিফ আমার বড় প্রিয় হওয়ায় সম্ভবত এ ব্যাপারে আমার উচ্ছ্বাস, কথা এবং ভাবভঙ্গিতে ধরা পড়ার জন্যে প্রশ্নকারীরা সাধারণত আর কিছু বলে না।

তবে একদিন এক শ্রীলংকান মেয়ে আমাকে যখন বলেছিল, তার এক মুসলমান বান্ধবী তাকে বলেছে তার বাবা-মা তাকে বাধ্য করে মাথায় কাপড় দিতে তখন হঠাৎ আমার কাছে তার এই প্রসঙ্গ তোলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়। মুসলমানরা মেয়েদের বেশি চাপের মধ্যে রাখে এটা বলাই হয়তো তার উদ্দেশ্য।

তাকে সেদিনের মতো ঠাণ্ডা করেছি এ ব্যাপারে উত্তর দিতে আমার অপারগতা প্রকাশ করে। কারণ পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোনো ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিভাবে ধর্ম পালন করছে তার জবাবদিহিতার দায়িত্ব আমার নয়। শুধু বললাম, দেখো, পুরুষ শাসিত দেশে বিভিন্ন অজুহাতেই মেয়েদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। সেটা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার গরিব দেশগুলোতেই নয়, এসব উন্নত দেশেও হয়।

সে মানলো কি না জানি না। তবে চুপ করে থাকলো। তার তোলা মেয়েদের ওপরে ধর্মীয় চাপের প্রসঙ্গে একটা ঘটনা ঘটলো কয়েকদিন পরে।

একদিন দেখি কয়েকজন বিভিন্ন দেশি কি যেন বিষয়ে কথা বলছে যার মধ্যে আপেল, সাপ ইত্যাদির কথা আসছে। আমি চোখ বড় করে বোঝার চেষ্টা করতেই একজন বললো, তুমি মনে হয় এটা বুঝবে না। এটা হচ্ছে বাইবেলের একটা ব্যাপার। বলে আদম-হাওয়ার সেই প্রথম অবাধ্যতার ঘটনা বলা শুরু করলো যার বক্তব্য হচ্ছে ইভ-ই প্রথম শয়তানের কথায় ভোলে এবং আদমকে ফল খেতে সেই প্ররোচণা দেয়। এ কারণে ভাবা হয় মেয়েরাই প্রথম পাপ শুরু করেছিল।

শুনে বললাম, এই ঘটনা আমাদের কোরআন শরিফেও আছে। তবে একটু পার্থক্য আছে। আমাদের কোরআন শরিফে বলা নেই *ইভ* অর্থাৎ হাওয়া বা আদমের কে প্রথম আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। তবে এ ঘটনা সম্পর্কে যতোগুলো বাক্য আছে তা থেকে অনুমান করা হয় সম্ভবত আদমই প্রথম আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন। আমাদের ধর্মে বলে না যে, মেয়েরাই প্রথম পাপ করেছে।

শুনে পেরু-র এক মেয়ে লাফিয়ে উঠে আমাকে নির্দেশ করে আনন্দিত স্বরে বললো, এদেরটাই তো ভালো!

তখন আমার হাসির উত্তরে অন্য একজন বললো, আসলে এরা রিলিজিয়াস। এরা বই পড়ে। আমরা তো আমাদের বাইবেল সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না।

তবে পরেও আর কেউ এ ব্যাপারে কোনো কিছু বলেনি।

এ দেশে প্রচুর বিদেশি আসে। তাদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়। আলাপের প্রথম পর্বেই জানা যায় কে কোন দেশ থেকে এসেছে। বাংলাদেশ শুনে দুই চারজন মাঝে মধ্যে মন্তব্য করে ও বাংলাদেশ! তোমাদের দেশে খুব বন্যা হয়, তাই না?

শুনে খুব দুঃখের সঙ্গে ভাবি, দুর্যোগ ছাড়া পরিচয় দেয়ার মতো কিছুই কি আর আমাদের দেশের নেই? তবে একদিন খুশি হওয়ার মতো একটা কথা শুনলাম। আমি বাংলাদেশের শুনেই চিলির এক ছেলে বলে উঠলো, তোমাদের দেশের ড. ইউনূসকে আমি চিনি। তারপর চার পাচটা বিভিন্ন দেশের মানুষের সামনে সে যখন ড. ইউনূস সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তার গুণগান করতে লাগলো তখন আনন্দে আমার মনটা ভরে উঠলো। অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগলো সেই মানুষটিরও প্রতি।

মনে পড়লো, বাংলাদেশে থাকাকালীন একটা ঘটনা। তখন প্রথমবারের মতো দুর্নীতিতে বাংলাদেশকে প্রথম স্থানে বসানো হয়েছে। তখনকার একটা পেপারে পড়েছিলাম, ড. ইউনূস এটার প্রতিবাদ করেছেন অল্প কিছু দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ ছাড়া বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই সৎ এ রকম একটা বক্তব্য দিয়ে। একটা জিনিস সম্ভবত তার কথায় ফিরে পেয়েছিলাম। তা হচ্ছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস।

পলিটিক্স শব্দটা বলতে আমি কূটকৌশলই বুঝি। তাই এটার ওপর বড় অশ্রদ্ধা। হয়তো কিছুটা ঘৃণাও। আজ এই প্রবাসী অবস্থায় বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য দেশগুলোর দিকে যখন একটু চোখ খুলে তাকানো শেখা শুরু করেছি বলে মনে হচ্ছে তখন থেকে পলিটিক্স সম্পর্কে ঘৃণা গেছে বহুগুণ বেড়ে। অবাক হয়ে শুধু একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি, বিশ্ব রাজনীতিতে যে ভয়ংকর কার্যকলাপ চলে তা চলে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এবং এমনকি তা চলে মানুষের বাড়ির মধ্যে ভাই ভাই এ পর্যন্তই।

আন্তর্জাতিক, জাতীয়, স্থানীয়, এমনকি পারিবারিক পলিটিক্সের বিষে জর্জরিত যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তখন দুই চারজন মানুষের কথা শুনে, কাজ দেখে একটু সুন্দর পৃথিবীর কল্পনা করতে ইচ্ছা করে। আসলে অসুস্থ মাতৃভূমির সীমা ছাড়িয়ে অসুস্থ পৃথিবীর বুকে পা রেখে পৃথিবীর মানুষের কাছে এছাড়া আর কিই বা মানুষের চাওয়ার থাকে!

ঠিকানাবিহীন

রানীর দেশে

– মুন্নুজান

হিথরো এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে অন্য যাত্রীদের পেছনে হাটতে থাকলাম। এক সময় সব নিয়ম-কানুন শেষে লাগেজপত্র সংগ্রহ করে কিছু দূর এগোনোর পরই দেখতে পেলাম আমার তপা, শাকের ও আনিশা হাসিমুখে দাড়িয়ে আছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তপার মুখ দিয়ে অনর্গল কথা ঝরছে। কথার জবাব দিতে দিতে এগোতে থাকলাম।

বাইরে গাড়ি দাড়িয়ে। আমরা যাবো এসেক্স-এর রমফোর্ড যেখানে শাকের চাকরি করে হাসপাতালে। নাম হেরোলউড হসপিটাল। হাসপাতালের কোয়ার্টারে তারা থাকে। চমৎকার ব্যবস্থা। পুরো ঘর, শোয়ার ঘর, ড্রায়িংরুম, রান্নাঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র হাসপাতালের। কিছুদিন পর পর বদলে দিয়ে যায়। আমার শোয়ার ঘর বাড়ির পেছনের দিকে। জানালায় বসলে পুরো বাগান দেখা যায়, ওয়াইল্ড চেরির ঝোপে থোকা থোকা ফল পেকে লাল হয়ে আছে। আমার মনে হয়, দিনের পর দিন ওখানটায় বসেই কাটিয়ে দিতে পারবো।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেপ্টেম্বর মাসের হাল্কা ঠাণ্ডার মধ্যে মনোরম পরিবেশ। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, যতো দিন ছিলাম, মশা, মাছি, আরশোলা, এমনকি ছোট পিপড়ের দেখা পেলাম না। হাচি, কাশি, সর্দি বোধহয় আছে। কিন্তু কাউকে চলার পথে কফ, থুথু ফেলতে দেখিনি।

বাতাসে ধুলোবালি নেই। গাছের পাতা, মাঠের ঘাস, পরিচ্ছন্ন সবুজ পাতায় চকচক করছে। মনে হয় এই মাত্র কেউ ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রেখে গেছে। লন্ডন শহরে যে আসবে সে দেখতে যাবে টাওয়ার বৃজ, টাওয়ার অফ লন্ডন, রানীর রাজকীয় মুকট, প্ল্যানেটরিয়াম, মাদাম টুসোর মোমের জাদুঘর, মিলেনিয়াম ডুম, ট্রাফালগার স্কোয়ার, টেমস নদীর নিচ দিয়ে হেটে গিয়ে গৃনিচ মানমন্দির, রামস্বামী মন্দির, আউটার সার্কুলার রোডের মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া, রানীর প্রাসাদ। লন্ডন শহরের দেখার মতো কোনোটাই বাদ রাখেনি।

আমার মেজ মেয়ে তপা আমাকে সব দেখিয়েছে, এমনকি রেড বৃকের বাঙালি পাড়া। সেখান দিয়ে হাটলে মনে হবে বাংলাদেশের একটি পথ দিয়ে আমি হাটছি। ইলফোর্ডের ইনডিয়ান শপ। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সব জিনিস ওখানে পাওয়া যায়। প্রত্যেকে এক ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিন কাটায়।

এখানে অলসভাবে শুয়ে-বসে সময় অপচয় করলে মনের মধ্যে পাপবোধ জন্মায়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত। তারপরেও কাজের শেষে এরা আনন্দ করে, অতিথি আপ্যায়ন করে। সে উপলক্ষে সুদানিজ, শ্রীলংকান, ইনডিয়ান, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি অনেকেই আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে এবং তাদের দেশের স্পেশাল ডিশ দিয়ে দিয়ে আপ্যায়ন করেছে।

যেমন সুদানিজ ডাক্তার মারুফ, বাংলাদেশি ডাক্তার আজমল। ভদ্রলোকের স্ত্রী নেই। তার নিজ হাতে রান্না ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে পুই শাকের ভাজি আমার মনে থাকবে। ওইদিন তিনি অনেক কিছুই রান্না

করেছিলেন। বিশেষভাবে ওইটিই আমার মনে থাকবে। প্রত্যেকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। তাদের কথা আমার মনে থাকবে। এর মধ্যে আমার বোন, ভাই, আত্মীয়রাও আছে।

আমি বৃটিশদের বাড়িতেও গিয়েছি। যে স্বল্প সংখ্যক বাড়িতে গিয়েছি প্রত্যেকের ঘরদোর দেখে অভিভূত হয়েছি। প্রবাদ বাক্যটি আমার মনে পড়ে গেল। হেভেন বা স্বর্গ হচ্ছে – ইংলিশ হাউজ, চায়নিজ ফুড, আমেরিকান স্যালারি, ইনডিয়ান ওয়াইফ।

হেল বা নরক হচ্ছে – চায়নিজ হাউজ, ইংলিশ ফুড, আমেরিকান ওয়াইফ, ইনডিয়ান স্যালারি।

মেয়ের জামাই শাকের রয়াল কলেজ থেকে অ্যানেসথেশিয়ায় পাস করেলো। তপার পড়াও প্রায় শেষ। আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে এলো। এবার বিদয়ের পালা। ইংরেজ ড্রাইভার আবার লন্ডন যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিল। আমি হিথরো এয়ারপোর্টে একা।

কতো অজানারে জানালে তুমি
কতো ঘরে দিলে ঠাই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

চট্টগ্রাম থেকে

ভায়রা ভাই

– আর.এস দিপু

৭ জুলাই ১৯৯৭ সালে আমি কুয়েত চলে গেলাম। সেখানে এলডিএ কম্পানিতে চাকরি শুরু করলাম। চোনডা হাউজে–এ থাকতাম। আমি ছিলাম বিদেশ বিভূইয়ে। এ জন্য প্রথম প্রথম নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না, খুব খারাপ লাগতো। একা একা মন খারাপ করে বসে থাকতাম দেখে আমার রুমমেট নবীনভাই এবং জাহিদ আমাকে খুশি রাখার জন্য মজার মজার কথা বলতেন। আস্তে আস্তে তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম।

আমরা তিনজন এক সঙ্গে পোড্ডার পার্কে প্রায় প্রতিদিন যেতাম, গল্প করতাম, বেড়াতাম। তারপর আবার হাউজে বসে আড্ডা দিতাম। নবীন ছিল বিবাহিত। সে মাঝে মধ্যেই বলতো তোমাকে ও জাহিদকে আমার স্ত্রীর দুই ছোট বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো এবং আমরা এক সঙ্গে সারা জীবন বাস করবো। এ জন্য আমরা মজা করে পরস্পরকে *ভায়রা* বলে সম্বোধন করতাম।

আমাদের সঙ্গে থাকতো ইব্রাহিম, মোস্তফা, সাঈদুরসহ আরো অনেকে। মাঝে মধ্যে গভীর রাতে সাগরের ধারে শুয়ে শুয়ে গল্প করতাম, দেশের কথা ভাবতাম। আবার কথায় কথায় হারিয়ে যেতাম অন্য জগতে যেখানে শুধু আমাদের হাসি–আনন্দের ছোয়া। কুয়েতের মানুষ খুব পরিশ্রমী যা আমাদের দেশে বড় অভাব। ওদের দেখে আমাদেরও অলসতা অনেকাংশে দূর হয়ে গিয়েছিল।

কখনো কখনো সবাই মিলে দর্শনীয় স্থান কে.এম টাওয়ার দেখেছি যা চোখকেও অবিশ্বাস্যের ফাদে ফেলে দেয়।

তিন বছর পর নবীনভাই, জাহিদসহ প্রায় সবাই চলে গেলেন। ওদের বিদায়ের সময় শোকে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভাষা আটকে গিয়েছিল। দুই দিন নাওয়া–খাওয়া বন্ধ ছিল। অবশেষে আমার রুমের ঝাড়ুদার খিজির আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। তারপরের চার মাস খুব কষ্টে কাটিয়ে দেশে ফিরলাম।

পিতা মাতার ইচ্ছায় ২০০২ সালের ২১ জানুয়ারিতে টাঙ্গাইলের মহেরা গ্রামে আমার বিয়ে হয় সুপ্তির সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর সুপ্তি বললো, দুলাভাইয়ের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই। এ কথা বলে সে আমার হাত ধরে পাশের রুমে নিয়ে এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললো, এই আমার দুলাভাই।

আমি হতবাক হয়ে চিরচেনা মুখ নবীনভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম।

আমাদের ছোট শ্যালিকা ছিল মেরিনা, তার বিয়ের বর দেখতে আমরা সিরাজগঞ্জ গেলাম জুলাই মাসে। যখন আমরা পাত্র দেখলাম তখন আমি ও নবীনভাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এ দেখছি আমাদের সেই জাহিদ। তারপর নিঃসংকোচে আমরা সাত দিনের মধ্যে ওদের বিয়ে দিয়ে দিলাম এবং আমরা হয়ে গেলাম সত্যিই ভায়রা ভাই। পুরনো মুখ যেন নতুন করে ফিরে পেলাম।

টাঙ্গাইল থেকে

ভীত

– সৈয়দ জুবায়ের

বছর দুই আগে যখন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ দুর্নীতির শীর্ষ পদে তখন পত্রিকায় এ খবরটি পড়ে আমার কলিগ ডেরেক কৌতুক ভরা মুচকি হাসি দিয়ে বলেছিল, বাংলাদেশ হলো বিশ্বের এক নাম্বার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। একটা অসহায় শুকনো হাসি ঠোটে লটকিয়ে বিদ্রূপটা হজম করলাম। এরপর বেশ কয়েকদিন খুব অস্বস্তি নিয়ে অফিস করেছি। কেবলি মনে হতো যেন ভরা মজলিশে আমার প্যান্টের পশ্চাৎ দিকটা ছিড়ে গিয়েছিল এবং সেই লোকগুলোই এখন যেন আমার চারপাশে।

গর্ব করার মতো ঘটনা আমাদের দেশে ঘটে না বললেই চলে। অনেক আগে একবার গর্বিত হয়েছিলাম যখন নিয়াজ মোর্শেদ গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন। আরেকবার হয়েছিলাম শুটিংয়ের কল্যাণে। প্রিয় দেশটি যখন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হলো, দারুণ গর্বিত হয়েছিলাম সেদিন। আমরা এখন বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের একটি। সেই গর্বটা এখনো করি এবং যাকেই বলি, বুঝতে পারি আমার ভালোবাসা তাকেও স্পর্শ করেছে।

আমি বাংলাদেশি শুনে বাহাত্তর বছরের শেফার্ড এগিয়ে এসে বললেন, আমি ১৯৫০-এ চট্টগ্রামে ছিলাম দুই ঘণ্টা। অফিসের কাজে গিয়েছিলাম। তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে। টরন্টোতে আমি বাংলাদেশের সিলভার হিলসা পাই না।

বাহান্ন বছর পরও তিনি যে বাংলাদেশের স্মৃতিচারণ করছেন এ আবেগেই আমার লোম দাড়িয়ে গেল।

বাংলাদেশের কথা যখনি কাউকে বলি তখনি বেশির ভাগই ব্ল্যাংক লুক বা শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়। যারা বলে, ও বাংলাদেশ! তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে জানো তুমি আমার দেশের কথা?

এতে তাদের অনেকেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কৌতূহলী হয়ে একটু চেপে ধরতেই কেউ কেউ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর রেফারেন্স টানে। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের বাংলাদেশ এখন দুষ্টের শিরোমণির বাংলাদেশ। আগে তবু প্রকৃতি ও ইনডিয়ার দোহাই দিয়ে বেচে যেতাম। এখন তাও পারছি না। অবশ্য গিরিলাল মোদিরা এখনো সক্রিয়।

একটা ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন এইডস-এর ওপর কাজ করে। আমিও তাদের রেগুলার ভলান্টিয়ার। এ কাজে একটি এইডস আক্রান্ত দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হলো। তাদের বাসায় মাঝে মধ্যেই যেতে হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভালো চাকরি করেন। মি. এবং মিসেস জ্যাকবসন একটা কালো বাচ্চা দত্তক নিয়েছেন। তিনি জর্জ হ্যারিসন-এর বিশেষ ভক্ত। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশও চলে এলো আলোচনায়। ভালো লাগলো ভদ্রলোক

বঙ্গবন্ধুর কথা বেশ জানেন দেখে। জানেন তার হত্যাকাণ্ডের কথা। তিনি এরশাদের কথাও জানেন। জ্যাকবসন হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলেন, শেখ এতো জনপ্রিয় তবু এমন নৃশংসভাবে নিহত হলেন কেন? আর কিভাবেই বা তার খুনিরা দেশে স্বাধীন থাকতে পারলো?

এর উত্তরে আমি কিছুই বলিনি। ফেরার পথে সারাক্ষণ কানে বাজতে থাকলো বাগ্মী মুজিব–এর ৭ মার্চের লোম দাড় করানো ভাষণ। চোখে ভেসে উঠলো মালেক উকিল–এর উক্তি, *ফেরাউনের মৃত্যু হয়েছে*। পত্রিকার হেডিং।

পচাত্তর বছরের যুবতী হানা যে কোনো যুবতীকে হার মানাতে রুচি, চলাফেরা আর অ্যাটিচিউড দিয়ে। গাইবান্ধা ট্র্যাজেডির কথা ইন্টারনেটে পড়ে অন্তত চারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে ভিকটিমদের কেউ আমার রিলেটিভ, পরিচিত কি না। তাকে আশ্বস্ত করতেই জানতে চাইলো, এমন দান–খয়রাত গভর্নমেন্ট বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হয় না কেন? এতোগুলো মানুষ মারা গেল বিনা কারণে যা অবশ্যই এড়ানো যেতো। আমি মনে মনে বললাম, তাহলে বড়লোকি প্রকাশ পাবে কি করে!

একটা মার্কেটিং কম্পানির বৃহত্তর টরন্টোর ম্যানেজার এন্ড্রু মিলিংটন জ্যামাইকান। তার সঙ্গে আমি অনেক দিন কাজ করেছি। খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু আমরা। সে তার জ্যামাইকা ছেড়ে আসার কথা বললো, আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা বললো।

আমিও বাংলাদেশের কথা বললাম, জিয়া–এরশাদ–হাসিনা–খালেদা সবার কথাই বললাম। বললাম ট্র্যাফিক জ্যাম–এর কথা। মিসেস হাসিনার শাসন আমলে বিমান–নৌ–সেনাদের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে দেখেছি। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে যুক্তি দিতাম, যার কাজ তাকেই করতে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সেভাবেই ডেভেলপ কতে হবে। সুযোগ–সুবিধা বাড়াতে হবে। ধার করা বৌ দিয়ে সব হয়, নিজের সংসার হয় না।

বন্ধুরা মানতে চাইতো না। ভিড় নেই, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে পারি এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। এই যেমন যৌথ বাহিনী ঠাণ্ডা করে দিল সন্ত্রাসীদের। কি শান্তি, কি আরাম! বুক ফুলিয়ে কাতলা মাছের মতো চলেছি রাস্তায়। যৌথ বাহিনী এখন নেই। তাই সোনার ছেলেরা বুকের মাপ নিচ্ছে সবার। যারটা একটু বেশি দেখছে তারটা কেটে নিচ্ছে আলতো করে। তাহলে এখন কি উপায়? ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন–এর কো–অর্ডিনেটর ডেভিড আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো – Syed, You know what, you need a dictator. An honest dictator. Democracy is not for you. But unfortunately dictators are not honest.

আমি স্বৈরাচারী এরশাদকে স্মরণ করলাম।

সাবওয়েতে কাজ করতে যাওয়া আসার পথে ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির এমবিএ–এর ছাত্র কেভিন–এর সঙ্গে প্রায়ই কথা হয়। কানাডাতে ক্রাইম রেট বেড়ে যাবার প্রেক্ষিতে সে ইনডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট–এর অবস্থা জানতে চাচ্ছিল। সন্ত্রাস দমনের প্রতি বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণের আন্তরিকতার কথা বললাম। সঙ্গে এও জানালাম যে বাংলাদেশ সরকার কমবাইন্ড ফোর্স নিয়োগ করেছে এবং সফল হচ্ছে বলা যায়। ঠিক এক সপ্তাহ পর পত্রিকায় দেখলাম যৌথ বাহিনীর নিরাপত্তা হেফাজতে যারা নিরাপদে নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি ব্যঙ্গ করে নতুন আইন আসছে। মনটা বিষিয়ে গেল। এই দূর পরবাসেও নিরাপত্তাহীনতার বোধ গ্রাস করছে।

পেশায় আমি জনসংযোগ কর্মকর্তা নিজের চাহিদা ও মেধা মার্কেট উপযোগী রাখার জন্য মাঝে মধ্যে একটা দুটো শর্ট কোর্স চাকরির পাশাপাশি অনেকেই করে এখানে। এমনি একটি কোর্স করতে গিয়ে পরিচয় হলো দুনিয়া চষে বেড়ানো পিআর ট্রেইনার ডেভিড হুকার–এর সঙ্গে। ঘটনাক্রমে আমার টিম–এর টিম লিডার–এর ভূমিকা তাকে পালন করতে হয়েছিল। তার বর্ণাঢ্য জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাকে ডেভিড–এর আরো কাছে নিয়ে গেল। বাংলাদেশের ছেল এই পরিচয় পেয়ে তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন Army is killing people, is it true?

আমি বললাম, আতংকে মারা যাচ্ছে অনেকেই। মোটেও ইচ্ছাকৃত না।

তিনি বললেন, Every single life is precious. A good army always tries to save life first, then disarm, then kill.

আমার প্রায় শূন্য গর্বের কুঠুরি আরো জোরে শব্দ করে উঠলো।

তারপরেও অনেক দিন পর গর্বে ভরে উঠলো বুক। এমন দিনের জন্যই তো অপেক্ষা করি আমরা। ইন্টারনেটে পাওয়া প্রায় সবগুলো পত্রিকার রিপোর্ট পড়েও যেন আশা মেটে না। আরো কিছু জানতে-শুনতে চায় মন। সাবাস বাংলাদেশ ফুটবল দল। তোমাদের পুনরুত্থানে আমরা গর্বিত। এই আনন্দ সেলিব্রেট করেছি পুরো অফিসকে (নিজের ফ্লোর) কফিতে আপ্যায়িত করে, সেই সঙ্গে জোর গলায় জানান দিয়েছি, ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটে কানাডাকে একটু ক্রিকেট শেখাবে। মান বিবেচনায় দুই দেশ, দুই ভুবনের বাসিন্দা বিবেচনা করে সবাই তা মেনেও নিয়েছে। অপেক্ষা করেছে আর এক কাপ কফির।

আজকে আমার অফিসের সবাই মিলে আমাকে এক বোতল শ্যাম্পেইন উপহার দিল। আমি পান করি না জেনেই দিয়েছে। আজকে আর কেউ কফির জন্য অপেক্ষা করছে না। সবাই আমার শ্যাম্পেইন খাবে! কিন্তু আমি তো তা হতে দিতে পারি না। ফেয়ার প্লে-তে না পারি। পরহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, চক্রান্তে আমাদের চেয়ে কে বেশি দক্ষ? আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টও তা জেনে গেছে। শ্যাম্পেইনের বোতলটা সাবওয়ের পাশে বসে থাকা হোমলেস যুগলটিকে দিয়ে দিয়েছি। এই রক্ত হিম করা ঠাণ্ডায় (-২৮০C) তারা একটু উষ্ণ হোক।

বাংলাদেশ আমার। যে দুটো কারণে তোমাকে ছেড়ে এসেছি তার একটা প্রাণভয়। তোমার সোনার ছেলেরা যেভাবে সারা দেশটাকে সমরাস্ত্র কারখানা বানিয়ে ফেলেছিল সেখানে স্বস্তিতে থাকা সম্ভব ছিল শুধু নাসিমদের। এখন মাঝে মধ্যে ফিরতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে ফিরে এসে আবার কাজে ঝাপিয়ে পড়ি। কিন্তু দ্বিতীয় ভয়টির কারণে তাও পারছি না। যদি আবার পান্থপথ-এ কাচের আড়ালের হিপোকৃটের খপ্পরে পড়ি! আবার যদি কেউ আমাকে তার ব্যর্থতার দায়িত্ব নিতে বলে!

yakid_bd@yahoo.com
কানাডা থেকে

বিস্ফোরণ

- মাজু ভুইয়া

সময়টা ছিল সাড়ে দশটা। ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১। আমি ছিলাম মিরাই ইউনিভার্সিটিতে। ফ্রান্সের টুলুস শহরে আমার ক্লাসে। আমার দুই কানে ছিল ইয়ারফোন, আঙুলে ধরা ছিল কলম। মনটা একেবারেই ডুবেছিল। হঠাৎ করে একটি ঝাকি খেলাম। মনে হলো ভূমিকম্প। আমার পাশে ছিল একজন জার্মান। তার দিকে আমি তাকালাম এবং তিনি আমার দিকে। তার চেহারায় ছিল ভয়ের স্পষ্ট ছাপ এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ংকর আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখনই দৌড়ে বেরিয়ে পড়ি। ক্লাসটি ছিল তিন তলায়। কিভাবে যে নিচে নেমেছিলাম তা আজ পর্যন্ত মনে করতে পারিনি।

নিচ তলায় যখন নামলাম তখন দেখলাম সব ভেঙে গেছে। এসব দেখে দৌড় দিতেও যেন ভুলে গিয়েছি। এদিকে বুক শুকিয়ে গিয়েছে ভয়ে। কোনো রকমে ক্যাম্পাসে এলাম। প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের গ্লাস ভেঙে গিয়েছে এবং বেশ কয়েকটা রুম ভেঙে গিয়েছে। অনেকের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল। অনেকে ভীষণ মুষড়ে গেছে। আবার অনেকে ভয়ে চিৎকার করে কাদছে, সেই সঙ্গে দেখলাম দূরে ধোয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ দিকবিদিক ছুটলাম।

মনে হলো আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি। আমি, আমেরিকান এবং জাপানিজ মেয়েটা ছুটলাম ব্যাগ আনতে। দৌড়ে ক্লাস রুমে গিয়ে দেখি ময়লায় রুমটা ভরে গেছে। বাকি ব্যাগগুলোও নিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে আসি। কাছেই মেট্রো। স্টেশনে গিয়ে দেখি মেট্রো বন্ধ। যাই বাস স্টেশনে। অনেকক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করি। পরে মনে হলো বাসও বুঝি থেমে গেছে।

আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে হাটতে লাগলাম। আমি আসছিলাম বড় বড় আবাসিক বিল্ডিংয়ের কাছ দিয়ে। প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের কাচ, দরজা, জানালা ভেঙে গিয়েছে। সব মানুষ বিল্ডিং থেকে নিচে দাড়িয়ে আছে। হয়তো তাদের মধ্যে অনেকেই জীবনের শেষ মুহূর্তের কথা মনে করছে। তাদের এ অবস্থা দেখে আমি যেন আরো রক্তশূন্য হয়ে যাই। মনে হলো এই বুঝি যুদ্ধ লেগে যাবে। আমি বুঝি আর আমার জন্মভূমিতে ফিরতে পারবো না। এমনকি আমার লাশটাও বুঝি বাংলাদেশের ছোট্ট একটি গ্রাম বড়রাজ পাড়ার মাটি পাবে না এ কথা মনে পড়ে অঝোরে আমার দুই চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো এবং তখন মনে হতে লাগলো কেনই যে এ দেশে এলাম। আজ এখানে আমি একা। কাউকে দেখবো না, কেউ আমাকে দেখবে না। এভাবে হতাশ ও অবশভাবে হাটছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি একটি ওভারবৃজে আসি। সেখান থেকে দেখতে পাই এক জায়গায় ধোয়া আর ধোয়া।

বৃজ থেকে নেমে দেখলাম মনে হলো মাটি বৃষ্টি হয়েছে। চারপাশে কাদামাটির মতো ছড়িয়ে আছে। এখানেও দেখতে পেলাম মানুষেরা রাস্তা কিংবা খালি জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। কিছু দূর এলাম। পরে দেখলাম, দুইজন মহিলা কোলে বাচ্চা নিয়ে দিকবিদিক ছোটাছুটি করছে। তাদের পায়ে কোনো জুতা ছিল না। কিন্তু রাস্তাগুলো কাচের টুকরোয় ছিল ভরা। মনে হলো আমার জুতাজোড়া খুলে দিই। কিন্তু মনে পড়লো, আমাকে কম করে হলেও দশ কিলোমিটার হাটতে হবে।

ওখান থেকে চলে গেলাম আমার প্রথম স্কুলে। তার পাশে ছিল ছোট ছোট বাড়ি। তা প্রত্যেকটাই ভেঙে গেছে। বয়স্ক অসহায় মানুষেরা বাড়ির সামনে দাড়িয়ে আছে। আমার নিজের মানসিক শক্তি একেবারেই ছিল না যার জোরে তাদেরকে বলবো, সাহায্য করতে হবে নাকি?

স্কুলে যাওয়ার আগেই দেখলাম বেশ কয়েকজন আহত অবস্থায় পড়ে আছে এবং অ্যাম্বুলেন্স তাদেরকে নিয়ে হসপিটালে ছুটছে। স্কুলের প্রত্যেকটা রুম ভেঙে গেছে। এখানে কাউকেই দেখতে পেলাম না। একটা কেবিন থেকে ফোন করতে চাইলাম। পারলাম না।

এদিকে যে কারখানাটায় বিস্ফোরণ ঘটেছে সেটা ছিল রাসায়নিক। তাই বাতাসে এর গ্যাস ছড়াচ্ছে। নাক, চোখ জ্বলা শুরু করেছে। আবার হাটা শুরু করলাম। একটু দূরে একজন লোক অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ছোটাছুটি করছে। তার শরীরে ছিল রক্ত, পাশে অবচেতন হয়ে রক্তেমাখা পড়ে আছে একজন নির্জীব মানুষ।

এই সব দেখে আমার রক্ত জমাট বাধছিল। কতো মায়েকে দেখেছি ছোটাছুটি করতে তার প্রাণাধিক প্রিয় বাচ্চাকে নিয়ে কিংবা বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনতে। দুর্ঘটনাটি ছিল শহরের একটু বাইরে। কিন্তু সারা এলাকা, শহরসহ সব মানুষ আতংকে মুষড়ে যায়। সব মানুষ যেন বোবা হয়ে গেছে। প্রায় দুই ঘণ্টা হেটে আমি বাসায় আসি। এই দুর্ঘটনায় আগে ও পরে মোট ৩০জন মারা যায়।

ভয়ে, আতংকে অনেক দিন রাতে ঘুমোতে পারিনি। বাংলাদেশকে খুব মনে পড়েছে, খুব মনে পড়েছে বাবার কথা। ওই সময় থেকে মনটা খুব চাইছিল দেশে যেতে, সবার সঙ্গে দেখা করতে। তাই বাংলাদেশে আসার ব্যবস্থাটা করতে থাকলাম। এর মাঝে দৈবক্রমে ১২ অক্টোবর ২০০১ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ভদ্রলোককে যথেষ্ট ভালো লাগলো। বেশ হাসি-খুশি, বলিষ্ঠ দেহ এবং প্রাণচঞ্চল। ভালো লেগেছে ওনার শক্ত হাতের করমর্দনের মৃদু ঝাকানি।

দেশের কথা মনে করে প্রায় অমনোযোগী হয়ে যাই। তাই দেশে যাওয়ার দশ দিন আগে রান্নার সময় গরম তেলে বাম হাতটা একটু পুড়ে যায়। হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে দেশে আসি। প্রত্যেক দিন ভোরে উঠেছি, লোকজনের সঙ্গে আলাপ করেছি, ঘুরেছি অনেক জায়গায়। বুক ভরে বাতাস নিয়েছি। সূর্যের প্রখর রোদে পুড়েছি। শরীর এবং ধুলার আমেজে মাটির গন্ধে ভরে গেছে দেহমন।

অনেকের কাছেই শুনি তারা বলেন, বাংলাদেশে ধুলা, গরম, খাবার ইত্যাদি নানান সমস্যা। তখন আমার খুব দুঃখ হয়। যে এই আলো বাতাসে বড় হয়েছে তাকেই আজ সে অবহেলা করছে, এ যেন কাকের ময়ূর সাজা। তবে কষ্ট হয় তখন, আমরা বিদেশে যারা থাকি তারা ওই সব দেশগুলোতে বিদেশি। আবার যখন জন্মভূমিতে আসবো তখন ওই একই শব্দটা শুনতে হয়। তাহলে আমাদের স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই। বিদেশ থেকে গেলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রায় সবার কাছ থেকেই একটি ভিন্ন ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায় যা কিছুটা হলেও বিব্রত হতে হয়। তাই আজ মনে হয়, আমাদের এই হতভাগ্যদের দায়িত্ব শুধু কাজ করা, তারা বঞ্চিত সমস্ত অধিকার থেকে। এবং প্রবাসীদের প্রতি কারো থাকে না কোনো দায়িত্ব।

এদের ভালোলাগা, সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ বলতে যে কিছু আছে তা কেউ বুঝতে চায় না। গুরুত্ব দেয়া হয় না তাদের মতামতের। বিবেচনা করা হয় না তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা। আমাদের দোষ আমরা প্রবাসী। যতোখানি আনন্দ নিয়ে দেশে গিয়েছিলাম বিপরীতে অনেক বেশি কষ্ট নিয়ে এলাম। শুধু জানলাম, কেউ আমাদের বুঝতে চায় না। তবে দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকবে চিরজীবন। এখনো মনে করি, আল্লাহ যেন আমার জীবনের শেষ দিনগুলো বাংলাদেশে রাখে। তবে জানি না বাংলাদেশে আবার কবে যাবো? হয়তো এ জীবনে আর নাও দেখা হতে পারে।

Maju@ureach.com
ফ্রান্স থেকে

বিধ্বস্ত সাধ

– মোহাম্মদ সেলিম

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সঠিক কতো আমার ঠিক জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, সেই সংখ্যার সঙ্গে আমিও যুক্ত। পরিবারের বড় সন্তান। নৈতিকতার দিক থেকে হাল ধরার দায়িত্ব আমার। বাবার অবসরের কারণে আমার দায়িত্ব বোধ আরো কিছুটা বেড়ে গেছে বৈকি। কিন্তু এই দেশের চাকরির যা অবস্থা! বিজ্ঞাপনে দেয়া থাকে চার, পাচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কিন্তু আমাদের চাকরি না দিলে অভিজ্ঞতা হবে কোত্থেকে? অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থেকেও প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বিশেষ লোককে বিশেষভাবে খুশি করতে না পারার কারণে সোনার হরিণ হাতছাড়া হয়ে যায়। আমার এক বন্ধু সামান্য সাব ইন্সপেক্টর পদের জন্য উপরের বসকে চার লাখ টাকায় কন্ট্রাক্ট করেছিল!

মানুষ দেশে থেকে যে কাজ করে না, বিদেশ গিয়ে তারচেয়ে হীন কাজ করে অবলীলায়। অনেকের মতো আমিও চাইলাম বিদেশ পাড়ি দিয়ে ভাগ্যের চাকা একটু সচল করতে। অনেক কষ্টে একটা ভিসা যোগাড় হলো। এদিকে আমার ছোট বোন যাবে ভিজিট ভিসা নিয়ে তার হাজব্যান্ডের কর্মস্থলে। চেষ্টা করলাম ফ্লাইট যাতে এক সঙ্গে হয়। শেষ পর্যন্ত আমারটা পিছিয়ে গেল।

বোনের ফ্লাইট সকাল নয়টায়। কাজ সারতে সময় লাগবে ভেবে ভোরেই চলে গেলাম। সঙ্গে আমার বড় দুলাভাই। পাচশ টাকায় দুটো দর্শনার্থী টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। বোনের ব্যাগেজ বুকিং দিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে তাকে ইমিগ্রেশনে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু আধঘণ্টা পর তাকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে কারণ

জানতে চাইলাম। ভেতরে সিভিল এভিয়েশনের দুজন লোক তাকে আটকে দিয়েছে। তার নাকি ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স নেই। এয়ারপোর্টের ভেতরের অনেক কর্মকর্তা জানালেন বোনের সব রকম বৈধ কাগজ পত্রাদি যেহেতু সঙ্গেই আছে সেহেতু তার ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স দরকার নেই। এদিকে ফ্লাইটের সময় ঘনিয়ে আসছে। গালফ এয়ার জানালো যাত্রী পাঠাতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। উল্লিখিত ব্যক্তি হঠাৎ সামনে এসে জানালো যাত্রী পাঠাতে অনুমতি দেয়া যাবে। তবে সাড়ে নয় হাজার টাকার দরকার হবে। তাকে একশ ডলার দিতে রাজি হলাম। সে তার কথায় অনড়। অবশেষে যাত্রা বাতিল করে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করলাম এবং বুঝতে পারলাম লোকটার আসল মতলব।

এই যে বাংলাদেশের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় দুর্নীতি ছড়িয়ে আছে তার জন্য যেমন যোগ্যতার নিরিখে চাকরি পাওয়া সম্ভব নয় তেমনি চাকরি পেয়েও সৎ থাকা সম্ভব নয়। ফলে প্রতি বছর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ঘোষণা দেয় দুর্নীতিতে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম।

সব ভুলে আমার কাগজপত্র ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বিমান অফিস, পাসপোর্ট অফিস, ম্যানপাওয়ার অফিস সবখানে চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত হা করে থাকে। ফরমালিটি সব মেইনটেন করে যাত্রার দিন ঠিক করি। ভোর রাতে ফ্লাইট বলে এগারোটার পর পর গিয়ে যাতে পৌছাতে পারি সেভাবে রওনা দিলাম। সঙ্গে এক মামা ছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর ড্রাইভার ছোরা হাতে এগিয়ে এলো। ব্যাগ-ব্যাগেজ তো নিলোই, উপরন্তু আমার হ্যান্ডব্যাগের প্রতি তার নজর পড়লো। তাতে নাকি ডলার আছে। এতো মিনতি তার কানে প্রবেশ করলো না। কি করবো। জীবনের দাম যে অনেক বেশি। সব কিছু নিয়ে সে কেটে পড়লো। মাথাটা ভীষণ চক্কর দিয়ে উঠলো। কতো সাধনায় সব গুছিয়ে নিয়েছিলাম।

নিকটস্থ থানায়, এয়ারপোর্টে অবহিত করলাম। পুলিশ আশ্বাস দিল আমরা খুজে দেখবো। অথচ আমার সময় মাত্র দুই ঘণ্টা। পুলিশ নিঃস্বার্থ কাজ করবে এতো আকাশ-কুসুম কল্পনা। সঙ্গে তো কিছুই নেই যে পুলিশের মুখে হাসি ফোটাবো। কষ্টে এবং অনাগত ভবিষ্যৎ মোকাবেলার চিন্তায় কখন যে চোখ ফেটে অশ্রুধারা শুরু হয়ে গেছে টেরই পাইনি। সারা রাত এয়ারপোর্টে কাটিয়ে সকালে বিধ্বস্ত ভবঘুরের মতো রওনা দিলাম বাড়ির পথে। কেননা সামনে অনেক পথ বাকি, অথচ সম্বল কিছুই নেই।

Salim4324@yahoo.com
পূর্ব মাদারবাড়ি, চট্টগ্রাম থেকে